হাজার প্রশ্ন ◆ ঘরে-বাইরে হুমায়ূন আহমেদ

ঘরে-বাইরে

হুমায়ূন আহমেদ

হাজার প্রশ্ন

ঘরে-বাইরে
হুমায়ূন আহমেদ
হাজার প্রশ্ন

মৌমিতা বুক ভিউ
২৯৩, বই মেলা
বাংলা একাডেমী

সাক্ষাৎকার ও গ্রন্থনা
মাহফুজ আহমেদ

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

প্রকাশনার চার দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© মাহফুজ আহমেদ
প্রথম প্রকাশ
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার ঢাকা
ফোন ২৪৯৪৬৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়
ধ্রুব এষ

প্রচ্ছদের ছবি
চঞ্চল মাহমুদ

কম্পোজ
চলন্তিকা কম্পিউটার্স
১৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
বসুন্ধরা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড
১৫ র‍্যাংকিন স্ট্রীট ওয়ারি, ঢাকা ১১০০

দাম
পঞ্চান্ন টাকা মাত্র

ISBN 984-410-032-1

GHAREY BAIREY HUMAYUN AHMED HAZAR PROSHNO : (Its an Exclusive Interview of an Eminent Writter) Interviewed by Mahfuz Ahmed. Published By Ahmed Mahmudul Haq of Mowla Brothers, 39 Bangla Bazar Dhaka 1100. Cover Designed By Druba Esh. Price: Taka Fifty Five Only.

উৎসর্গ

ফজিলাতুন্নেসা
মকবুল আহমেদ
আমার দেখা দু'জন শ্রেষ্ঠ বাবা-মা

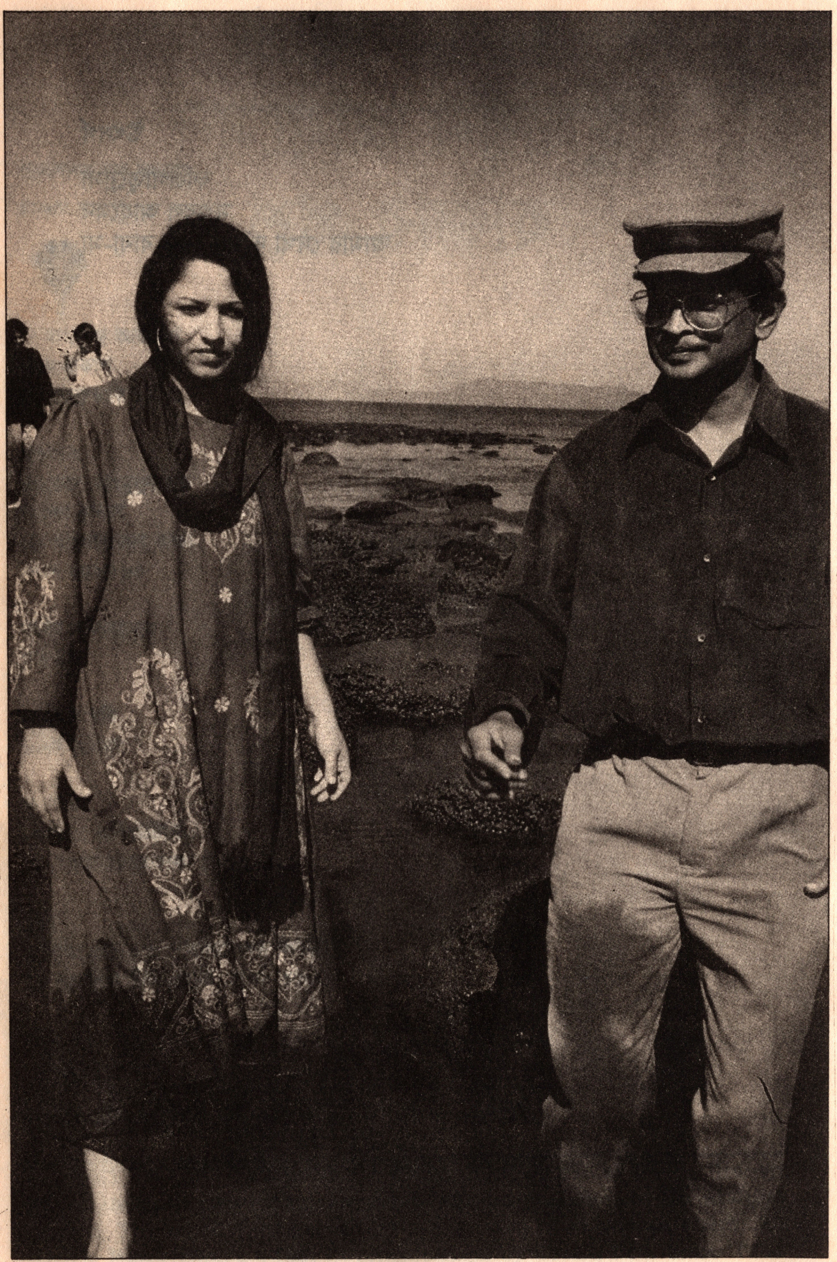

প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনে লেখক ও লেখক পত্নী

মুখবন্ধ

হুমায়ূন আহমেদ বড় লেখক কি না আমি জানি না। কারণ তা বিচার করার মত মেধা আমার নেই। মানুষের প্রতি যাঁর সমুদ্র-সমান ভালবাসা তাঁকে কি বড় মানুষ বলা যায়? যদি যায় হুমায়ূন আহমেদ অনেক বড় মানুষ। আমার বিশ্বাস লেখক হুমায়ূন আহমেদের চেয়েও। যা বিশ্বাস করেন অকপটে বলেন। কি কথায়, কি লেখায় মেলে ধরেন নিজের বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের কথা, ভালবাসা ও ভালবাসাহীনতার কথা। অবলীলায় তিনি বলেন, খালেদা-হাসিনা কেউই দেশ পরিচালনার জন্যে যোগ্য নেত্রী নন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সাধারণ ক্ষমা প্রসঙ্গে তাঁর মত হচ্ছে : তিনি তা একক দায়িত্বে করেছেন। আবার তিনি রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে দীর্ঘদিনের চলে আসা দ্বন্দ্বেরও অবসান চান। তবে অবশ্যই রাজাকারদের প্রকাশ্য ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে।

ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কেও অত্যন্ত স্পষ্ট তাঁর বক্তব্য। বলেছেন আস্তিকতায় নিজস্ব আস্থা ও বিশ্বাসের কথা।

তিনি অসম্ভব অন্তর্মুখী। ঘনিষ্ঠজন ছাড়া নিজেকে খোলেন না। নিজের সম্পর্কে একেবারে বলেন না। বাইরে থেকে মনে হবে তীব্র অহংকারী ও মেজাজী। কিন্তু ঘনিষ্ঠজনদের কাছে তাঁর চেয়ে প্রাণখোলা ও হৃদয়বান মানুষ আর হয় না। এই বেড়াজাল হুমায়ূন আহমেদের তৈরি। ইচ্ছে করলেই তিনি তা ডিঙাতে পারেন না।

'না' শব্দের প্রয়োগ খুব কম লোক জানেন। হুমায়ূন আহমেদ তাঁদের একজন। তবে অসম্ভব মমতা ও ভালবাসার কাছে প্রায়ই হার মানেন।

সেন্ট মার্টিনে কেন বাড়ি বানালেন হুমায়ুন আহমেদ? এটা কি নিজস্ব বিলাস ও আনন্দের জন্যে? আমার কখনও তা মনে হয়নি। এদেশে অনেকেই তো বিত্তের সীমানা অতিক্রম করেছেন। কই, এর আগে কাউকে তো ওখানে বাড়ি বানানোর কথা শুনিনি? শুনেছি কোনো নির্জন এলাকায় বিশাল জায়গা নিয়ে বাগানবাড়ি বানাতে। সমুদ্রের কাছে আশ্রয় চাইতে শুনিনি। আমার মনে হয়েছে আমেরিকায় সমুদ্র তীরে কোনো এক ভরা পূর্ণিমায় তিনি যে সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়েছিলেন একদিন; সেই অসাধারণ অনুভূতির ছোঁয়া দিতে চেয়েছেন অন্যদেরও। কোনো আনন্দ তিনি একাকী ভোগ করতে পারেন না। ছড়িয়ে দেন আশে-পাশের সবার মধ্যে। হুমায়ূন আহমেদ সবসময় বলেন, নিজের আনন্দের জন্যে লেখেন। আসলে কি তাই? হয়ত। হয়ত না। আমার মনে হয়েছে এই আনন্দও তিনি ভাগাভাগি করে নেন পাঠকের সঙ্গে।

'আয়োময়' টিভি ধারাবাহিকের একটি গানে হুমায়ূন আহমেদ বলেছেন, আমার মরণ যেন হয় চাঁদনি প্রহর রাতে। ভরা জোৎস্নায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে কেন চাইলেন তিনি? মৃত্যুর মত পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত একটি মুহূর্তে তিনি জোৎস্নার আলো চেয়েছেন কেন? আসলে মৃত্যুর মধ্য দিয়েও তিনি সৌন্দর্যকে ধরতে চেয়েছেন। সত্যকে ছুঁয়ে যেতে চেয়েছেন। তাঁর সমস্ত লেখায় এই একটি বিষয় অত্যন্ত যাদুকরী সুরেলা ছোঁয়া পেয়েছে। জানি না হুমায়ূন

আহমেদের অসংখ্য পাঠক এই যাদুকরী স্পর্শের ছোঁয়া পেয়েছেন কি না। হুমায়ূন আহমেদ উপার্জনের অনেকটাই খরচ করেন দেশে-বিদেশে ঘুরে। এমন কোনো মাস যায় না, যে মাসে তিনি কোথাও বেড়াতে যান না। এটা কি নিছক বেড়ানো? আমার কখনো মনে হয়নি। মনে হয়েছে সৌন্দর্যের সন্ধানে তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টায় এটিও একটি অংশ।

হুমায়ূন আহমেদের লেখার প্রতি কেন লক্ষ লক্ষ পাঠক আবিষ্ট হয়ে আছেন? কেন তাঁর টিভি নাটকের জন্যে উন্মুখ হয়ে জেগে থাকা? তাঁর সৃষ্ট একটি টিভি নাটকের চরিত্র নিয়েও গোটা বাংলাদেশ কেন আন্দোলিত হয়? বাংলা ভাষাভাষীদের হৃদয়ের সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদের কেন এই অকাট্য যোগসূত্র তৈরি হলো? এর উত্তর হয়ত সমাজবিদরা দিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সংসারটাকে হেসে হালকা করে রাখা কম কথা নয়। যেটি হুমায়ূন আহমেদ করেছেন তাঁর লেখায়, তাঁর কথায়। তাঁর লেখা বাহারী আলোয় চোখ ঝলসে দেয় না, চোখ খুলে দেয়। চোখ বন্ধ করে দেখতে চাইলে কেউ কেউ এর সন্ধান পেতে পারেন।

শুধু তাঁর লেখায় মোহাবিষ্ট হয়ে থাকেন না অসংখ্য পাঠক। যারা তাঁর কাছে গেছেন আর ছেড়ে আসতে পারেননি। সমস্ত কাজ ফেলে সঙ্গে থেকেছেন। হুমায়ূন আহমেদ কখনও সঙ্গ ছেড়েছেন কিন্তু তাঁরা ছাড়তে পারেন নি। অদ্ভুত এক আবেশ মিশিয়ে রেখেছে তাঁদের। অসম্ভব আকর্ষণী ক্ষমতা হুমায়ূন আহমেদের। স্মৃতিশক্তি অকল্পনীয়। ক'বছর আগের কথাও হুবহু বলে দিতে পারেন।

আমার লেখা বই বেরুবে? তাও আবার হুমায়ূন আহমেদের ওপর? কখনও ভাবিনি আমি। মাওলা ব্রাদার্সের মাহমুদ ভাই পত্রিকায় আমার নেয়া হুমায়ূন আহমেদের একটি সাক্ষাৎকার পড়ে বললেন, আমি নাকি পারবো। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। তীব্র উৎসাহ এসে ভিড় করে আমার মাঝে। এই উৎসাহ ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যায় আমাকে। শেষ পর্যন্ত কতটা কি হয়েছে আমি জানি না। তবে বই প্রকাশের আনন্দে আমি তিরতির করে কাঁপছি। পাঠক-পাঠিকারা বইটি কিভাবে নেবেন, আদৌ নেবেন কি না তা ভেবেও আমি কম কাঁপছি না। এইসবের জন্যে সমস্ত কৃতজ্ঞতা হুমায়ূন স্যার ও মাহমুদ ভাইয়ের কাছে।

এই বইয়ের নাম প্রথমে ঠিক করেছিলাম 'হুমায়ূন আহমেদকে হাজার প্রশ্ন।' নাম দেখেই পাঠক হয়ত প্রশ্নসংখ্যা গুনতে বসে যাবেন, এই বিড়ম্বনা থেকে মুক্তির জন্যে মাওলা ব্রাদার্সের পরিচালক মাহমুদ ভাই নাম দিলেন, হাজার প্রশ্ন: ঘরে বাইরে হুমায়ূন আহমেদ। হুমায়ূন আহমেদের বই পড়ে, নাটক দেখে পাঠক ও দর্শকের মনে যে নানা প্রশ্ন জমা হয়েছে, সমালোচকরা যে যে কারণে হুমায়ূন আহমেদকে তীব্র বাক্যবাণে জর্জরিত করেন, এসবের ভিত্তিতেই এই বইয়ের যাবতীয় প্রশ্ন। এবার উৎসাহী পাঠকরা সরাসরি এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। লেখক ও ব্যক্তি হুমায়ূন আহমেদকে ঘিরে যত প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে আপনাদের মনে, জানালে পরবর্তী সংস্করণে উত্তরসহ প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রিয় পাঠক, আপনারাই জেনে নিন আপনাদের প্রিয় লেখকের 'ঘরে বাইরে'।

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ **মাহফুজ আহমেদ**

লেখকের কথা

মাহফুজ আহমেদ আমার কাছে হাজার প্রশ্ন নিয়ে এসেছে। সে নাকি প্রশ্ন দিয়ে বই করবে। বই প্রকাশের জন্যে প্রকাশকও নাকি সে জোগাড় করেছে—মাওলা ব্রাদার্স। আমি তার উৎসাহ দেখে বললাম, আচ্ছা দেখা যাক। এই ছেলের ধৈর্য্য রবার্ট ব্রুসের কাছাকাছি। সে দিনের পর দিন আমার কাছে আসতে লাগল। একজন মানুষকে যে কতভাবে বিরক্ত করা যায় তা সে জানে।

একসময় বিরক্ত হয়েই তার প্রশ্নের জবাব দিতে বসলাম। প্রশ্ন আর শেষ হয় না। দিনের পর দিন টেপ রেকর্ডারের সামনে কথা বলতে হয়। এক পর্যায়ে এমন হল যে তাকে বললাম, তুমি এক কাজ কর—নিজেই প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর লিখে ফেল। তুমি যা লিখবে তাতেই আমি সাইন করে দেব। আমাকে মুক্তি দাও।

সে মুক্তি দিল না। হাজার প্রশ্ন সে শেষ করল। তাৎক্ষণিক ভাবে যা আমার মনে এসেছে আমি বলেছি। কিছু উত্তর হয়ত আরো গুছিয়ে দিতে পারতাম। দেয়া হয়নি, কারণ প্রায়ই আমার ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে। তার পরেও বলছি-উত্তরের সব দায়দায়িত্ব আমার।

এই হাজার প্রশ্নের উত্তর পড়ে কারো কোনো লাভ হবে কি না আমি জানি না। বই বিক্রি হলে প্রকাশকের খানিকটা লাভ হতে পারে। আমি মাহফুজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—বইটি তুমি কেন করছ? সে বলল, এই বই পড়ে যাতে পাঠক-পাঠিকারা আপনার সম্পর্কে জানতে পারে সেজন্যেই করা।

আমার কথা হল—প্রশ্ন করে কি আর মানুষ চেনা যায়? আমি নিজেই নিজেকে জানি না, আর তুমি হাজার প্রশ্ন করে আমাকে জেনে ফেলবে?

যাই হোক— হাজার প্রশ্নে যদি আমাকে জানা যায় সেটাই বা কম কি? আমি ঠিক করেছি—বই প্রকাশিত হলে আমি বইটি খুব মন দিয়ে পড়ব—নিজেকে ভালমত জানার জন্যে।

অসময়ে উৎপাতের জন্যে মাহফুজকে আমি অনেক বকাঝকা করেছি। আশা করি বই প্রকাশের আনন্দে তার দুঃখ ঢাকা পড়বে।

বইটির প্রচ্ছদে প্রশ্নকর্তার নাম নেই, ব্যাপারটা মনে হয় প্রকাশক ইচ্ছা করে করেছেন, যাতে পাঠক-পাঠিকারা মনে করে বইটা আমারই লেখা এবং ঝট করে কিনে ফেলে। পাঠক-পাঠিকাদের প্রকাশকরা এত বোকা কেন ভাবেন তা কখনো আমার মাথায় আসে না।

আশা করি বইটির নতুন সংস্করণে প্রশ্নকর্তার নাম থাকবে।

হুমায়ূন আহমেদ

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
এলিফেন্ট রোড, ঢাকা

প্রকাশকের নিবেদন

হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যে বাংলাদেশে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পেয়েছে তাঁর নিজস্বতার জন্য। কোনোরকম ভান, আড়াল বা আড়ম্বর নেই। সর্বত্র তিনি সরল, সুন্দর, এবং স্বচ্ছন্দ। একজন লেখকের বড় কৃতিত্ব বোধ করি পাঠকের মন জয় করা; হুমায়ূন আহমেদ শুধু জয়ই করেননি, সকলের মনে স্থায়ী প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছেন। এই বইটিতে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর সাহিত্যচর্চার রহস্যগুলি মেলে ধরেছেন এবং সেইসাথে দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম, প্রেম প্রভৃতি বিষয়ে অকপটে বলেছেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ বলে কোনো কথা তাঁর গোপন করতে হয়নি; সে জন্যে নিষ্ঠুর কটাক্ষে ও তিনি বিব্রত নন। সহজেই বলেছেন : তাঁর সাহিত্য আনন্দের জন্যে এবং কেবল আনন্দের জন্যে। একথা এ শতকের গোড়ায় একবার রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তার পর কেউ কেউ......।

আর হুমায়ুন আহমেদ বললেন শতাব্দীর সূর্যাস্তরেখায়। তবে একেবারে ভিন্ন ভঙ্গিতে, নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। আশা করি বইটি পড়ে পাঠক হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন অনেক অজ্ঞাত তথ্য এবং না-বলা বহু কথা। তাঁর পাঠকরা সেইসাথে পাবেন কিছু দুর্লভ ছবি তাঁদের প্রিয় লেখকের।

বইটির পরিকল্পনা আজ থেকে প্রায় বছরখানেক আগে একটি সাপ্তাহিকে হুমায়ূন আহমেদের সাক্ষাৎকার পড়ে। সেই সাক্ষাৎকারটি ছিল মাহফুজ আহমেদের নেয়া। মাহফুজ আহমেদকে যখন বললাম, সাক্ষাৎকারভিত্তিক বইয়ের কথা—তিনি যারপরনাই অবাক হলেন; বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আমি কি পারব?

মাহফুজ আহমেদ এই কষ্টসাধ্য কাজটি করেছেন তাঁর পেশাগত নিষ্ঠার সাথে। এই তরুণ সাংবাদিক নাট্যগোষ্ঠী ঢাকা পদাতিকের একজন সক্রিয় সদস্য।

বইটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন শিল্পী ধ্রুব এষ। প্রচ্ছদের ছবিটি তুলেছেন চঞ্চল মাহমুদ। এঁদের সবাইকে আমাদের অভিনন্দন। পাঠকদের জন্যে শুভেচ্ছা।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ — প্রকাশক

সাহিত্য

“নন্দিত নরকে” নামের ছোট্ট একখানা বই লিখে আশাতীত সাফল্য লাভ করেন হুমায়ূন আহমেদ তাঁর সাহিত্যচর্চার গোড়ায়। তারপর হুমায়ূন আহমেদ একাধারে গল্প, নাটক, উপন্যাস লিখে গেছেন এবং তাঁর খ্যাতি বাঙালী লেখকদের সকল কিংবদন্তীকে অতিক্রম করেছে।

হুমায়ূন আহমেদকে তাঁর সাহিত্য বিষয়ে অসংখ্য প্রশ্ন করেছি। প্রবেশ করতে চেয়েছি বিভিন্ন বই এর বইয়ের লেখকের ভেতর। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর আখ্যান তৈরির গল্প বলেছেন কখনো কখনো, কখনো নিজের কোনো কোনো বই বিষয়ে একেবারে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন, কখনো তাঁর সাহিত্যের প্রেরণা বিষয়ে এমন তথ্য শুনিয়েছেন - আমরা আশ্চর্য হই।

বিভিন্ন প্রশ্নে চেষ্টা করেছি তাকে অবাক কিংবা বিব্রত করতে। তিনি অবাক হননি। দৃঢ়ভাবে বলে গেছেন নিজের কথা। তাঁর কথা শুনি, এবং শুনতে থাকি ধীরে ধীরে আমার মনে একজন অনেক বড়ো লেখকের ছবি আঁকা হয়ে যায়।

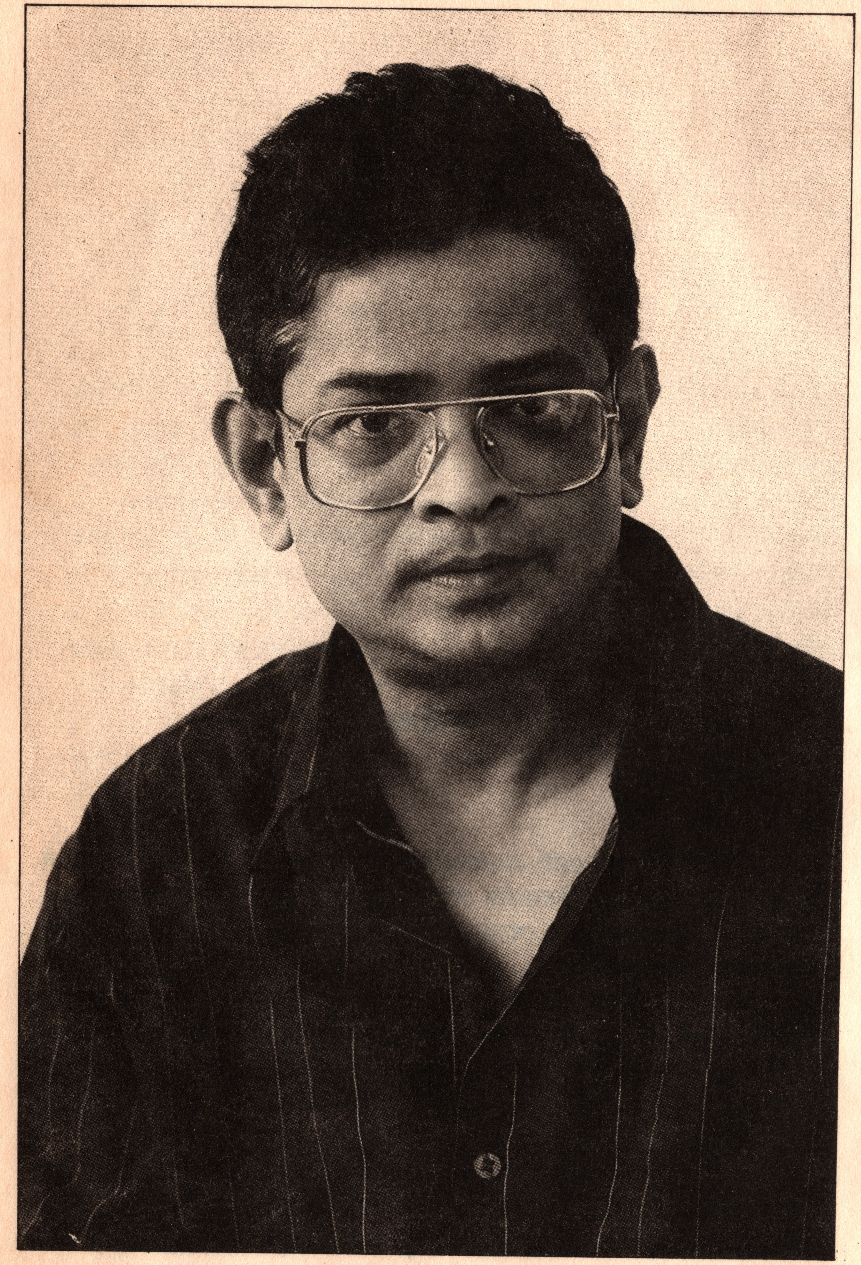

সাহিত্য

প্রশ্ন ঃ আপনি যা লেখেন তা বিশ্বাস করেন? আর যা বিশ্বাস করেন তাই কি লেখেন ?

উত্তর ঃ লিখে বিশ্বাস করা নয়, বিশ্বাস করে লেখা। আমি যা বিশ্বাস করি তাই লিখি। প্রথমে বিশ্বাস তারপর লেখা।

প্রশ্ন ঃ একজন লেখকের কমিটমেন্ট কোথায়? লেখক তাঁর ভূমিকা কিভাবে রাখেন?

উত্তর ঃ লেখকের কাজ হচ্ছে সৌন্দর্য আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করা। আমার মতে এটিই তাঁর একমাত্র কমিটমেন্ট।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একজন জনপ্রিয় লেখকের কমিটমেন্ট কি হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ লেখকমাত্রই সৌন্দর্য আবিষ্কার করবেন, তিনি জনপ্রিয় হোন আর নাই হোন। লেখকের ভূমিকা জনপ্রিয়তা নির্ভর নয়। এটা কোনো উৎপাদিত পণ্যের বেলায় হতে পারে। লেখা কোনো পণ্য নয়।

প্রশ্ন ঃ লেখকের আবিষ্কৃত সৌন্দর্যের স্বরূপ খানিকটা ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর ঃ একজন লেখকের লেখায় উঠে আসবে জীবনের সৌন্দর্য, প্রকৃতির সৌন্দর্য, স্বাধীনতার সৌন্দর্য, বন্ধন এবং বন্ধনহীনতার সৌন্দর্য, বিশ্বাস এবং ভালবাসার সৌন্দর্য।

প্রশ্ন ঃ সৌন্দর্যের উল্টোপিঠেই থাকে কুৎসিত একটা দিক। তা কি লেখকের আবিষ্কার থেকে দূরে সরে যাবে?

উত্তর ঃ আমি মনে করি না কুৎসিত বা অন্ধকারের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সুন্দরের ব্যাখ্যা হলেই অসুন্দর ধরা পড়ে। আলো বুঝতে পারলেই অন্ধকার বোঝা যায়।

প্রশ্ন ঃ যে-সব লেখক সৌন্দর্যের পাশাপাশি কুৎসিত বা অন্ধকারের খোঁজও করেন?

উত্তর ঃ একেক লেখকের একেক পদ্ধতি। এটা লেখকের স্বাধীনতা। আমার পদ্ধতি কেবলই সৌন্দর্য আবিষ্কার এবং তার ব্যাখ্যা দাঁড় করানো। অনেক লেখক আছেন শুধু অন্ধকার নিয়েই কাজ করেন। সেখান থেকে আমরা বুঝে নিই আলো।

প্রশ্ন ঃ আপনি কেন কেবলই সৌন্দর্যের পেছনে তাড়িত হন? অসুন্দর কি কখনো আপনাকে বিচলিত করে না?

উত্তর ঃ বিচলিত করে, তবে লেখার সময় ঐ দিকটি দূরে সরিয়ে রাখি।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখার সহজ-সরল, উদ্ভট চরিত্রগুলোর সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়?

উত্তর ঃ নিয়মিত না হলেও মাঝে-মধ্যে দেখা তো হয়ই।

প্রশ্ন ঃ আপনি যে-সব সুন্দর-সাবলীল, মজাদার চরিত্র সৃষ্টি করেন, কই সেই চরিত্রগুলোর সঙ্গে তো আমাদের দেখা হয় না?

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই দেখা হয়। হয়তবা চোখ এড়িয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ আমাদের হাতের কাছে যাদের পাই তাদের সঙ্গে কত পার্সেন্ট কল্পনা মেশালে আপনার চরিত্রগুলোর মতো কথা বলবে, ভালবাসবে?

উত্তর ঃ শতকরা হিসাব বলতে পারব না।

প্রশ্ন ঃ চারিদিকে এত নৈরাজ্য, হাহাকার, তা কিন্তু আপনার লেখায় দেখা মেলে না। কোনো অবক্ষয়ের কথা বলছি না, বলতে চাইছি আশেপাশের এত স্বপ্নহীন ব্যস্ত চালাক মানুষের ভিড়ে আপনি কি করে কালি-কলমে ফুল ফোটান?

উত্তর ঃ একজন লেখক তো শুধু কালি-কলমেই ফুল ফোটাবেন। তা দেখে যদি রাজনীতিবিদ এবং সমাজবিদরা মনে করেন প্রয়োজন আছে, তবে তাঁরা বাস্তবে ফুল ফোটানোর ব্যবস্থা করবেন। লেখকের কাজ শুধু মনে করিয়ে দেয়া। আমি লিখবো

'এই দিন দিন নয়, আরও দিন আছে
এই দিনেরে নেবে তারা সেই দিনের কাছে।'

এই নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব রাজনীতিবিদ ও সমাজপতিদের।

প্রশ্ন ঃ একজন লেখকের সঙ্গে ডাক্তারের ভূমিকার কোনো মিল খুঁজে পান?

উত্তর ঃ চিকিৎসক দেহ-মনের চিকিৎসা করেন। যদিও লেখককে অনেক সময় সাইকিয়াটিস্ট-এর সঙ্গে তুলনা করা হয় তবুও আমি এই দু'য়ের মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাই না। চেষ্টাও করি না।

প্রশ্ন ঃ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে রোগ উপশমের সঙ্গে সঙ্গে রোগ সারাবার একটা শাশ্বত চেষ্টা থাকে। লেখকের শাশ্বত চেষ্টা কি?

উত্তর ঃ আগেই তো বলেছি লেখক উপাসনা করেন সৌন্দর্যের। একসময় সৌন্দর্যকে বুঝতে পারবেন। এটাই তাঁর শাশ্বত চেষ্টা।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি চান পাঠক যতক্ষণ আপনার বই পড়বে ততক্ষণ সবকিছু ভুলে থাকুক? আনন্দে থাকুক? বেদনায় মাখামাখি হয়ে চোখের জল ফেলুক? সারারাত আপনার লেখার কোনো চরিত্র হয়ে স্বপ্নে বিচরণ করুক? বলছি, একজন পাঠকের জীবনে আপনার ভূমিকা কি শুধু তাৎক্ষণিক, একদিন বা একরাতের ভাললাগা? দুঃখ পাওয়া? কিংবা আনন্দে বিভোর হওয়া?

উত্তর ঃ এটা পুরোপুরি পাঠকের ব্যাপার। আমি নিজের আনন্দের জন্যে লিখি। পাঠক তা তাৎক্ষণিক, একদিন বা সারা জীবন ভরে উপভোগ করবে কিংবা আদৌ করবে কি না অবশ্যই তা পাঠকদের ব্যাপার। এ-নিয়ে আমার কোনো ভাবনা নেই।

[সঙ্গে সঙ্গে পাশে বসা মিসেস হুমায়ূন বললেন, 'তুমি তো সবসময় নিজের আনন্দের জন্যে লেখ না। চাপে পড়েও তো লেখ।' হুমায়ূন বললেন, 'সেই লেখাও আমার আনন্দ বা ভাললাগা থেকেই বেরিয়ে আসে'।

প্রশ্ন ঃ আপনার জবাব থেকে পাঠকরা মনে করতে পারেন আপনি ভীষণ অহংকারী। জেদীও।

উত্তর ঃ সত্যি কথা বলার মধ্য দিয়ে যদি অহমিকা প্রকাশ পায়, তবে তো করার কিছু নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখায় প্রায়ই অস্বাভাবিক চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায়। কেন?

উত্তর ঃ স্বাভাবিকতার চেয়ে অস্বাভাবিক কিছুর দিকে আমার নজর বেশি থাকে। অসংখ্য স্বাভাবিক চরিত্রের ভিড়ে একটি অস্বাভাবিক চরিত্র আমাকে চমকে দেয়।

প্রশ্ন ঃ আর মানুষকে চমকে দেয়ার জন্যেই এই কৌশল?

উত্তর ঃ কেউ এটাকে কৌশল ভাবলে কিছু বলার নেই।

প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্র সঙ্গীতের কোনো লাইন কখনো কখনো আপনার বইয়ের নাম হয়ে আসে। কিন্তু বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রায়ই যার মিল নেই। যেমন, এ-যাবত আপনার সবচেয়ে বিক্রিত উপন্যাস তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে।

উত্তর ঃ 'তুমি আমায় ডেকেছিলে, ছুটির নিমন্ত্রণে' বইয়ের এত বড় নাম কেউ রাখে? আমার রাখার কারণ, আমি ভেবেছি এই লাইন দু'টি পড়ামাত্র পাঠকের মনে হবে পুরো গানটির কথা। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় চলে আসবে ছুটির আমেজ। আর এই উপন্যাসে সবাই তো ছুটিতে গিয়েছিল। হয়ত দাওয়াতের মাধ্যমে নয়, মনের আমন্ত্রণে। একেবারে দাড়ি-কমা মিলিয়ে দেখলে তো হবে না।

প্রশ্ন ঃ আপনার ব্যাখ্যা নিয়েও ভুল বোঝার অবকাশ আছে।

উত্তর ঃ আমি মনে করি না। আমি বইয়ের নামের মাধ্যমে ছুটির আমেজ ছড়িয়ে দিতে চেয়েছি কেবল। এখন কে কিভাবে ব্যাখ্যা করল তা আমার ভেবে দেখার বিষয় নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি নিজে কখনও কোনো লেখকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বা হচ্ছেন বলে মনে হয়েছে?

উত্তর ঃ যদিও এটা অহমিকা হয়ে যায় তবু বিনয়ের সঙ্গে বলছি, প্রভাবিত অবশ্যই হয়েছি, কিন্তু লেখার সময় লিখেছি নিজের মতো। অনুকরণ আমার পছন্দের বিষয় নয়।

প্রশ্ন ঃ একজন লেখক আরেকজন লেখককে কিভাবে প্রভাবিত করে বলে আপনার ধারণা।

উত্তর ঃ অনেকভাবেই করেন। বড় লেখকের প্রভাবিত করার ক্ষমতাও বড়।

প্রশ্ন ঃ কোনো কোনো সমালোচক বলেন, শরৎচন্দ্রের প্রভাব এখনও আপনার মধ্যে কাজ করে, কিন্তু এ সমাজ এখন অনেকদূর চলে এসেছে।

উত্তর ঃ সমালোচকেরা অনেক কথাই বলেন। কেউ কেউ তো বলেন, আমি গদ্য লিখতেও শিখিনি।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখার কোন দিকটা আপনাকে কাছে টানে--গাঁথুনি, বর্ণনা, নাকি ভাষা?

উত্তর ঃ আমি আমার নিজের রচনার গুণমুগ্ধ পাঠক। আলাদা করে কোনো বিশ্লেষণে যেতে চাচ্ছি না।

প্রশ্ন ঃ সমালোচকদের কেউ কেউ এও বলেন, আপনি সুচিন্তিতভাবে প্রতিটি লেখায় হিউমার ব্যবহার করেন, জীবনের গভীরে যা আঘাত করে না।

উত্তর ঃ হিউমার সম্পর্কে একটি অত্যন্ত বাজে ধারণা আছে এখানকার কিছু লেখক ও সমালোচকদের মাঝে। হিউমার যুক্ত হলেই নাকি লেখা হালকা হয়ে যায়। সস্তা জনপ্রিয়তার জন্যেই নাকি এই কৌশল। তাদের বোধহয় জানা নেই এ-দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষের কথাবার্তায় কত হিউমার। বাঙালি চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মজা করে কথা বলা। যে-কোনো সাধারণ কিছু রহস্য করে বলা। আমার কাজ তো সাধারণ জীবনকেই তুলে আনা। হিউমার জীবন থেকেই আসছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন এক দশক পর কেউ আপনার লেখা পড়বে? দেখেছি অনেক জনপ্রিয় লেখক একটা সময়ের পর আর গৃহীত হন না।

উত্তর ঃ উত্তরটা একটু অন্যভাবে দিই। আমি কোথাও গেলে একা যাই না। দলবল থাকে। বন্ধু, প্রিয়জন, স্ত্রী-সন্তান। কোনো সৌন্দর্য একাকী দেখতে আমার খারাপ লাগে, তাই। আমার কোনো বিস্ময়, কোনো আনন্দ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারলে কী যে ভালো লাগে! আনন্দের শেষ থাকে না। তা যে করতে পারছি, এটাই আমার বড় পাওয়া। এক দশক পর কেউ আমার লেখা না পড়ুক পড়াশেষেই ভুলে যাক। এতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনি লেখায় একইসঙ্গে প্রচণ্ড আবেগ ও যুক্তি দাঁড় করান। আপনার 'হিমু' আবেগতাড়িত আর মিসির আলি যুক্তিনির্ভর। দেখা যায় আপনি একইসঙ্গে লজিকের কথা বলেন, আবার অ্যান্টিলজিকের কথাও বলেন। পাঠকরা এতে বিভ্রান্ত না হয়ে পারে?

উত্তর ঃ শুধু লজিকের ওপর পৃথিবী চলে না। আবার কেবলই অ্যান্টিলজিকের ওপরও চলে না। একটা ভারসাম্য থাকে। একই মানুষের মধ্যে একইসঙ্গে লজিক এবং অ্যান্টিলজিক কাজ করে। এটাই পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম। পাঠকদের বিভ্রান্ত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তবে একটি কথা, আবেগের মধ্যেও যুক্তি থাকতে হবে। যুক্তিহীন আবেগ হতে পারে না। 'হিমু'র প্রতিটি আবেগ যুক্তিনির্ভর।

প্রশ্ন ঃ লেখক এবং মানুষ হিসেবে আপনার লিমিটেশনস্ নিয়ে কখনও ভেবেছেন?

উত্তর ঃ লেখক হিসেবে আমার লিমিটেশনস্ বের করবেন গবেষকরা, সমালোচকরা। আর মানুষ হিসেবে আমার লিমিটেশনস্ বলতে পারবে আমার স্ত্রী, সন্তান এবং প্রিয়জনেরা।

[স্বামী হিসেবে হুমায়ূন আহমেদ কেমন? এই প্রশ্ন স্বয়ং হুমায়ূন আহমেদ করেছিলেন স্ত্রী গুলতেকিন'কে। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি জানালেন, ১০০ নাম্বারে বড়জোর ৩৩ দেয়া যায়। মানে টেনে-টুনে পাস নাম্বার। স্ত্রীর জবাব শুনে হুমায়ূন আহমেদের চোখ প্রায় কপালে উঠে যায়। অবশ্য পরক্ষণেই দু'জন প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়েন]

প্রশ্ন ঃ আপনার বয়স তো কম হল না। কিন্তু এ-যাবৎ কোনো তরুণ লেখককে উৎসাহিত করেছেন বলে তো জানি না। আপনাকে আহমদ ছফা একজন প্রকাশকের কাছে নিয়ে যান। যার ফলাফল আপনার প্রথম উপন্যাস নন্দিত নরকে। আপনি অনুরোধ করলে নিশ্চয়ই অনেক তরুণের লেখা প্রকাশকরা নেবে।

উত্তর ঃ আমার কাছে এ-যাবৎ যত লেখা এসেছে, উল্লেখ করার মতো একটিও পাইনি। ভাল লাগেনি। যদি কোনো তরুণের লেখা ভাল লাগে অবশ্যই আমি তার জন্যে কিছু হলেও করব। আমার লেখা আহমদ ছফা পছন্দ করেছেন বলেই নিয়ে গেছেন প্রকাশকের কাছে। আর কোনো প্রকাশনা সংস্থা থেকে আমার ৩/৪টি বই বেরুলেই আমি অনুরোধ করি একজন নতুন লেখকের বই ছাপতে। আমি জোর খাটাতে পারি না। এটা ঠিকও নয়। একটি বইয়ের পেছনে ৭০/৮০ হাজার টাকা খরচ। আমি তাদের ব্যবসা প্রভাবিত করতে পারি না। প্রকাশনা শিল্প একটা ব্যবসা। এরা কেউ সাহিত্যসেবা করতে বসেনি। কেউ জোর দিয়ে বললেও আমি বিশ্বাস করব না। পৃথিবীর সব বড় বড় প্রকাশনা সংস্থা নিজেদের ব্যবসায়ী বলেই দাবি করে।

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রায় উপন্যাসের নায়িকা সুন্দরী। ভীষণ রূপবতী। সুন্দরীদের প্রতি এটা হয়ত আপনার দুর্বলতা। কিন্তু দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক হিসেবে আপনার অসংখ্য পাঠিকা আছেন যারা দেখতে অসুন্দর কিন্তু আপনার ভীষণ ভক্ত। এদের ওপর বিরূপ মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া পড়ছে বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেন।

উত্তর ঃ লেখক হিসেবে রূপ দেয়ার ব্যাপারটি যেহেতু আমার হাতে, তাই কার্পণ্য করি না। আসলে আমি ভীষণ সৌন্দর্যপ্রিয়। কালো মেয়েদের ক্ষেত্রে আমি প্রায়ই 'মায়াবতী' শব্দটি প্রয়োগ করি। যেখানে 'রূপবতী' ব্যবহার করি সেখানে কিন্তু 'মায়াবতী' করি না।

প্রশ্ন ঃ আপনার অধিকাংশ বইয়ের আয়তন ছোট। অনেকটা ছোটগল্পের মতো। সে তুলনায় দাম অনেক বেশি। এটা পাঠকের জন্যে বিড়ম্বনা। অনেক পাঠক আফসোস করে বলেন এত টাকা দিয়ে কিনলাম, এত তাড়াতাড়ি শেষ!

উত্তর ঃ বইয়ের দাম ঠিক করার ব্যাপারে আমার বলার কিছু থাকে না। তবুও অন্যান্য লেখকের চেয়ে আমার বইয়ের দাম কিছুটা হলেও কম বলেই জানি। অন্য

লেখকের কোনো বইয়ের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতি ফর্মা (১৬ পৃষ্ঠা) যেখানে ১০ টাকা ধরা হয়, আমার কোনো বইয়ে ধরা হয় ৮ টাকা। এতেও অনেক পাঠকের ক্রয়সীমানায় আসছে না একটি বই। তবে পাঠকদের জন্যে একটি সংবাদ হচ্ছে, অচিরেই আমার লেখা সব বইয়ের পেপার ব্যাক বেরুচ্ছে। তখন আমার কোনো বইয়ের দামই ১৫ থেকে ২০ টাকার বেশি হবে না। যেহেতু সাদা কাগজে দাম কমানো যাচ্ছে না, তাই এই ব্যবস্থা আমার নিজের নেয়া।

প্রশ্ন ঃ আপনি প্রচুর লেখেন। এত লিখে কি প্রত্যাশিত মান বজায় রাখা সম্ভব? যদিও আপনি বলেন— 'লেখার আনন্দে লিখি।'

উত্তর ঃ আমি প্রচুর লেখায় বিশ্বাসী। আমি বিশ্বাস করি, লেখককে লিখতে হবে ক্রমাগত। রবীন্দ্ররচনাবলীর দিকে নজর দিলেই টের পাওয়া যায়। আমি মাত্র দু'টি উপন্যাস লিখব, আর তা থেকেই আশা করব অনেক বড় স্বীকৃতি— এই রীতিতে আমি বিশ্বাসী নই। আমি প্রচুর লিখে যাব। আজীবন লিখতে চাই। এর মধ্য থেকে যদি কোনো ভাল লেখা হয় টিকে থাকবে, আলোচিত হবে। অথবা হবে না।

প্রশ্ন ঃ আপনি যা লেখেন, তাই কি প্রকাশকের হাতে তুলে দেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, যা লিখি প্রকাশক নিয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ পছন্দ হয়নি বলে ফেলে দিয়েছেন অনেক লেখা। এমন উদাহরণ আছে আপনার বেলায়?

উত্তর ঃ না, নেই। পছন্দ হয়নি এমন লেখা কয়েকবার কাটাকাটি করেছি, কয়েকবার লিখেছি। দু'-এক বছর পর প্রকাশকের হাতে দিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার রচনা কি দ্রুত তৈরি হয়ে যায়? নাকি বেশ সময় নিয়ে লেখেন?

উত্তর ঃ ঠিক নেই। কোনোটি একদিনেই শেষ করলাম, কোনোটি এক বছরেও শেষ করতে পারি না। 'নন্দিত নরকে' আমার একরাতে লেখা, কিন্তু তিন বছর থেকে ক্রমাগত চেষ্টা করেও মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটা বড় উপন্যাসের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে ঘুরছি, একটি লাইনও লিখতে পারিনি।

প্রশ্ন ঃ পুরনো কোনো লেখা পড়ে কখনও মনে হয়েছে কি, তা এখন লিখলে তার চেয়ে অনেক ভালো হত?

উত্তর ঃ আমার পুরনো অনেক বই আমি সময় পেলেই পড়ি, কিন্তু কখনও মনে হয় না এখন লিখলে আরও ভাল লিখতাম। ভাবি অন্যরকম লিখতাম। পরে মনে হয় সেই সময় যে মানসিকতায় ছিলাম, ঠিকই ছিল। কোনোরকম পরিবর্তন করতে ইচ্ছে হয় না।

প্রশ্ন ঃ আমাদের ভবিষ্যৎ সাহিত্যের অবস্থা, গতিপ্রকৃতি কোনদিকে এগুবে কিছু অনুমান করছেন?

উত্তর ঃ সাহিত্য সবসময় একটি কাজ করে। আমাদের যে জীবন তার ব্যাখ্যা করে। এটা সাহিত্যের মূল কাজ। আমাদের সমাজ যেদিকে যাবে সাহিত্যও সেদিকে যাবে। তবে সাহিত্যের মূল যে কথা—সত্যের অনুসন্ধান বা সৌন্দর্য আবিষ্কার, তা

বহাল থাকবে। বহিরঙ্গের হয়ত পরিবর্তন হবে, কিন্তু মূল সুর আগে যা ছিল তাই এবং ভবিষ্যতেও সেটাই থাকবে।

প্রশ্ন ঃ এটা কি মনে করেন যে অনেক সময় প্রকাশক বা সম্পাদকের তাগিদে একটি সুন্দর, আকর্ষণীয় স্বপ্নকল্পনা বাস্তবরূপ পেতে পারে? নাকি লেখকের সৃষ্টি সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত তাগিদের ফসল?

উত্তর ঃ বাইরের তাগিদেও অনেক ভাল লেখা হতে পারে। আমি অনেক লেখকের লেখার কথা জানি যেগুলো প্রচণ্ড চাপের মুখে লেখা, কিন্তু বেশ উঁচুমানের। চেখভের কথা জানি, প্রায়ই খেতে বসে দেখতেন ঘরে কোনো খাবার নেই কিংবা রুটি আছে, সঙ্গে কিছু নেই। তখন কাগজ টেনে লিখতে বসে যেতেন। লেখাশেষে ছেলেকে তা নিয়ে পাঠাতেন এবং এভাবে খাবার সংগ্রহ করা হত। কিন্তু এই প্রচণ্ড চাপের মুখের লেখায় মানের কোনো হেরফের হয়নি। দস্তয়ভস্কি অনেক উপন্যাস লিখেছেন জুয়া খেলার পয়সা যোগাড়ের জন্যে। তাতে তাঁর লেখার মানের বিন্দুমাত্র তারতম্য হয়নি।

প্রশ্ন ঃ বাংলা ভাষার কোনো লেখকের কথা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়?

উত্তর ঃ সুবোধ ঘোষের কথা জানি। 'দেশ' পত্রিকায় প্রচণ্ড চাপের মুখে তাঁকে একটা লেখা দিতে হয়েছিল। এক পাতা লিখে শেষ করছেন আর তা কম্পোজে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি প্রচণ্ড চাপের মুখে লিখেছেন কিন্তু আপনার একটি প্রিয় লেখা, এমন উদাহরণ আছে?

উত্তর ঃ 'নক্ষত্রের রাত' 'বিচিত্রা'র চাপের মুখে লিখেছি। ঈদ সংখ্যায় আমার লেখার জন্যে জায়গা খালি রাখা হয়েছে। না লিখলে ওভাবে প্রেসে পাঠানো ছাড়া গতি নাই। আমি তখন প্রচণ্ড অসুস্থ। জন্ডিস। কিছুক্ষণ লিখেই শুয়ে পড়ি। বিশ্রাম নিই, আবার লিখতে বসি। এভাবে শেষ করি। 'আমার আছে জল' নামে একটি উপন্যাস আছে আমার। এটিও ভয়াবহ চাপের মুখে লেখা। 'বিচিত্রা'র ঈদ সংখ্যার জন্যে। দু'টি উপন্যাসই প্রচণ্ড টেনশন ও চাপের মধ্যে লেখা, কিন্তু দু'টিই আমার খুব প্রিয় উপন্যাস। অনেকে বলেন, আমার চাপের মধ্যে লেখাগুলো ভাল না। জানি না সত্যি কি না।

প্রশ্ন ঃ স্রষ্টা সৃষ্টি করেন, একজন লেখকও সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রে একজন লেখকের সঙ্গে স্রষ্টার কোনো মিল খুঁজে পান?

উত্তর ঃ গড অলমাইটি'র সঙ্গে কোনো তুলনা হয় না। কারণ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তিনি নিজেও উপস্থিত থাকেন, কিন্তু একজন লেখকের সৃষ্টিতে লেখকের উপস্থিতি খুবই নগণ্য। আর গড অলমাইটি সম্পর্কে যেহেতু আমাদের কোনো পূর্ণ ধারণা নেই, তাই এক্ষেত্রে তুলনা করাটা আমি বোকামি মনে করি।

প্রশ্ন ঃ গ্যেটে একজন লেখকের দু'টি গুণের কথা বলেছেন— সততা ও প্রশান্তি। একজন লেখকের দুর্বল ভাষা ও প্রকরণ শিথিল হওয়ার পরও রচনার ভিত্তি সম্পর্কে সততা বজায় থাকলে সেই লেখা কি উতরে যেতে পারে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, পারে। আমার তো মনে হয় অবশ্যই পারে। মনে করুন একটা মহান

গ্রন্থ রুশ ভাষায় লেখা। এটা অনুবাদ করা হবে আমাদের মতো করে। গ্রন্থের মূলভাব ঠিক রেখে যদি এই অনুবাদ সবাইকে আকর্ষণ করতে পারে তা হলে তো দোষের কিছু নেই। কাজেই ভাষা লেখালেখির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অবশ্যই, কিন্তু প্রধান ব্যাপার নয়। আন্তরিকতা ও সততা অনেক বড় ব্যাপার। এখানে একটি গুণের কথা বলা হয়নি। এটা আমি খুব প্রয়োজনীয় মনে করি, তা হচ্ছে মমতা। একজন তখনই লেখক হবেন, যাদের নিয়ে লেখা তাদের প্রতি যদি তাঁর অসম্ভব মমতা থাকে। যাদের সম্পর্কে লেখা তাদের প্রতি যদি মমতা না থাকে, তবে সেই লেখা কখনও বড় লেখা হবে বলে আমি মনে করি না। আমি অনেক বড় লেখক সম্পর্কে জানি। মানুষের প্রতি যাঁদের মমতার সীমা-পরিসীমা নেই। প্রফেটদের যেরকম মমতা থাকে মানুষের প্রতি, লেখকদেরও একইরকম মমতা থাকে। যাঁর এই মমতা থাকে তিনিই লেখক হিসেবে উতরে যাবেন, বড় হবেন। নইলে লেখক হিসেবে দাঁড়াতে পারবেন না। শরৎচন্দ্র এত বড় লেখক। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অসম্ভব মমতা। বাংলার বঞ্চিত মেয়েদের প্রতি এত দরদী চোখ আর কারও পড়েনি। বিভূতিভূষণ যে দরদ দিয়ে দুর্গা এবং অপু'র কথা লিখেছেন, মানুষের প্রতি তীব্র মমতা না থাকলে এটি সম্ভব হত না। মানুষের প্রতি তীব্র মমতা ছিল বলেই তাঁরা বড় লেখক হতে পেরেছেন। মানুষের প্রতি অবহেলা এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কেউ লিখে যাবেন প্রচণ্ড মেধা দিয়ে, সেই লেখা কখনও বড় লেখা হবে না। সেই লেখা হবে মিডিওকার লেখা। মানুষের প্রতি মমতাবোধ, এটিও কিন্তু আবার ভেতরে দিয়ে দেয়া। একোয়ার করা যায় না। কাউকে ট্রেনিং দিয়ে মমতা শেখানো যায় বলে আমার মনে হয় না। কেউ কেউ জন্মাই নেয় প্রচণ্ড মমতা নিয়ে। মাদাম তেরেসা তো একজনই হন। প্রত্যেকে তো আর মাদাম তেরেসা হয় না। যেমন আমাদের কোরআন শরীফে আছে, প্রত্যেকের ভাগ্য লিখে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। কে কি হবে না হবে সবকিছু আগ থেকেই ঠিক করা।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখার সঙ্গে রড ম্যাকুইনের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দু'জনই অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় লেখেন। তফাৎ একটাই—আপনি গদ্য লেখেন, আর ম্যাকুইন পদ্য। আপনার অসংখ্য ভক্ত পাঠক জানতে চান কেন আপনি কবিতা লেখেন না?

উত্তর ঃ রড ম্যাকুইনের কবিতা আমি পড়িনি। কবিতাকে সবসময় আমার নিজের ধরাছোঁয়ার বাইরে মনে হয়। আমাকে দিয়ে এই কর্ম হবে না। এতে কষ্ট পাইনি। কারণ সবাইকে দিয়ে সবকিছু হয় না। যেমন আমাকে দিয়ে গানও হয়নি।

প্রশ্ন ঃ আপনি একজন কেমিস্টও। পার্ল ক্রীমে যেহেতু আপনি জানেন মারকারি থাকে, সেহেতু অনেক অর্থ-বিত্তের বিনিময়েও আপনি পার্ল ক্রীম বানাবেন না। আর যত সুন্দরই লাগুক কাউকে মাখতে বলবেন না। এটা একজন বিজ্ঞানীর দায়িত্ব। একজন লেখক হিসেবেও আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না এমন কিছু সৃষ্টি করতে যা কেবলই ভাল লাগার বিষয়। আপনি প্রচুর লেখেন। প্রায় সবসময় হাতে কলম রাখেন। এত চাপের

মধ্যে বিষয়টি আপনার মনে থাকে?

উত্তর ঃ না, মনে থাকে না। ইচ্ছে করেই মনে রাখি না। আমি অনেকবার বলেছি আমি লিখি নিজের আনন্দের জন্যে। প্রকাশকের চাপ আছে ঠিক, কিন্তু তা আমার আনন্দকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। পার্ল ক্রীম আর আমার লেখাকে এক করে দেখা কি ঠিক?

প্রশ্ন ঃ আপনি নিজের আনন্দের জন্যে লেখেন। আর সেই আনন্দ ভাগ করে নেয় পাঠকরা। যখন আপনার লেখা পড়ে কোনো পাঠক আনন্দ পাবে না, তখনও কি লিখে যাবেন কেবলই নিজের আনন্দের জন্যে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, লিখে যাব—যতদিন হাত আছে, চোখ আছে, মনের শক্তি আছে। হয়ত বই প্রকাশিত হবে না কোনো প্রকাশক আসবে না।

প্রশ্ন ঃ আপনার কাছে পাঠকের স্থান কোথায়?

উত্তর ঃ আমার পরেই। প্রথমে আমি, তারপর পাঠক।

প্রশ্ন ঃ যদি কোনো পাঠক অভিযোগ করেন যে, পাঠকদের প্রতি আপনার কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই? ভালবাসা নেই?

উত্তর ঃ কি আর করব, চুপ করে থাকব। যা সত্য আমি তাই বললাম। আমি মিথ্যে বা বানিয়ে বলতে পারি না।

প্রশ্ন ঃ মধ্যবিত্তের স্বপ্নের জগৎ নিয়েই আপনার অধিকাংশ লেখা। উচ্চবিত্ত, বস্তি বা গ্রাম নিয়ে তেমন লেখেন না কেন?

উত্তর ঃ ওদের নিয়ে যে লিখি না তা না। কম লিখেছি। কারণ, ওদের আমি ভালভাবে জানি না।

প্রশ্ন ঃ বলা হয়ে থাকে লেখকের মূল ক্ষমতাই হচ্ছে তাঁর কল্পনাশক্তি। আপনার কল্পনাশক্তিতে ওদের উপস্থিতি এত কম কেন?

উত্তর ঃ কল্পনার বীজ থাকে বাস্তবে। অভিজ্ঞতা এবং যুক্তি ছাড়া শুধু আবেগ বা কল্পনায় ভর করে চলতে ইচ্ছে হয় না।

প্রশ্ন ঃ লেখালেখিতে আপনি হিউমারকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন কেন?

উত্তর ঃ হিউমার আমাদের মধ্যে আছে, তাই। আমরা রামগরুড়ের ছানা নই। দুঃখ-কষ্টেও আমরা হাসি।

প্রশ্ন ঃ হিউমার বাদ দিয়েও বড় লেখা হতে পারে বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই পারে। কেন পারবে না?

প্রশ্ন ঃ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি বড় ধরনের লেখা লিখবেন বলে অনেক আগে বলেছিলেন। ছুটি নিয়েছেন, কিন্তু কথা রাখেননি।

উত্তর ঃ আমি কথা রাখি। বিশেষ করে যে, কথা নিজের সঙ্গে তা তো রাখতেই হবে। প্রয়োজনে আবার ছুটি নেব। কাজ শেষ করবই।

প্রশ্ন ঃ কারা আপনার প্রিয় লেখক?

উত্তর ঃ সবচেয়ে প্রিয় জন স্টেইনব্যাক। তাঁর হিউমার আমাকে প্রচণ্ড আকর্ষণ করে। চার্লস ডিকেন্স, টমাস হার্ডি, দস্তয়ভস্কি এবং টলস্টয়ও খুব প্রিয়।

প্রশ্ন ঃ আর বাংলা সাহিত্যে?

উত্তর ঃ বাংলা সাহিত্যে জীবিত লেখকদের মধ্যে শীর্ষেন্দু, সুনীল, সমরেশ মজুমদার, রমাপদ চৌধুরী। একেবারে পানির মতো সহজ গদ্য। ভঙ্গিও চমৎকার।

প্রশ্ন ঃ এ-দেশের শওকত আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখের লেখা সম্পর্কে আপনার কি মন্তব্য?

উত্তর ঃ আমার জন্যে এই প্রশ্নের জবাব দেয়া ভীষণ বিব্রতকর। বিপজ্জনকও। তবুও বলছি --আমি সৈয়দ সামসুল হকের লেখা পছন্দ করি। হাসান আজিজুল হক আমাকে তেমন কাছে টানে না। শওকত আলীর লেখায় মাস্টারি মাস্টারি ভাব, যা ভাল লাগে না। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখা ভাল লাগে। বেশ শার্প হিউমার তাঁর লেখায়।

প্রশ্ন ঃ ইমদাদুল হক মিলন সম্পর্কে আপনার মন্তব্য?

উত্তর ঃ তাঁর কিছু কিছু লেখা খুব ভাল লেগেছে। যেমন পরাধীনতা। তরুণ-তরুণীর স্বপ্ন তাঁর রচনায় সুন্দর আসে। তাঁর ভাষা সুন্দর ও স্বচ্ছ। তরুণদের মধ্যে মইনুল আহসান সাবের এবং মঞ্জু সরকারও সুন্দর লেখেন।

প্রশ্ন ঃ কখনও কি মনে হয় যে, ক্রমেই আপনি মধ্যবিত্তের স্বপ্নের জগতে আটকা পড়ে যাচ্ছেন?

উত্তর ঃ আমার কাছে মনে হয় না। আর হলেও খুব একটা ক্ষতি আছে বলে মনে করি না। আমি যদি সমাজের একটি অংশকেও ধরতে পারি, সেটাই আমার জন্যে অনেক বড় পাওয়া। আমি কারো সঙ্গে তুলনায় যাচ্ছি না। বিনয়ের সঙ্গে বলছি — শেক্সপীয়রও লিখেছেন সমাজের একটি অংশকে নিয়ে। রাজা, রানী, রাজ্য, সৈন্য--এসব তাঁর লেখায় উঠে এসেছে বেশি। তিনি তো পৃথিবীখ্যাত একজন লেখক। শুধুমাত্র একটু ব্যাখ্যা করার জন্যে উদাহরণটি দিলাম। শেক্সপীয়র কেন, কোনো লেখকের সঙ্গেই নিজেকে তুলনা করার স্পর্ধা আমার নেই, যোগ্যতাও নেই।

প্রশ্ন ঃ লিখতে লিখতে কখনো কি ক্লান্তি অনুভব করেন?

উত্তর ঃ লেখার সময় আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। এত আনন্দ অন্য কিছুতে পাই না। একটানা দিনের পর দিন লিখলেও আমার ক্লান্তি আসে না। যতক্ষণ লিখি আনন্দে মাখামাখি হয়ে থাকি।

প্রশ্ন ঃ কখনো কখনো লিখতে লিখতে আপনি নাকি অঝোরে কাঁদতে থাকেন?

উত্তর ঃ মনে মনে যে গল্প দাঁড় করাই, নিজেকে তার মাঝখানে আবিষ্কার করি আমি। চরিত্রগুলোর সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেই। মনে হয় আমার চারপাশে সবকিছু ঘটছে। কখন যে দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে টেরও পাই না।

প্রশ্ন ঃ কোন ধরনের লেখায় সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান?

উত্তর ঃ সায়েন্স ফিকশনে।

প্রশ্ন ঃ জীবনে প্রথম লেখার কথা মনে আছে?

উত্তর ঃ জীবনের প্রথম লেখা আমার কুকুর নিয়ে। লেখাটির নাম দিয়েছিলাম 'আমাদের বেঙ্গল টাইগার'। এই নামে আমাদের একটি কুকুর ছিল। একদিন আমার ছোট ভাই শাহিন'কে [আহসান হাবীব, বর্তমানে উন্মাদ পত্রিকার সম্পাদক] কেউটে সাপ কামড় দিতে যাবে, অমনি কুকুরটি দৌড়ে এসে সাপটিকে কামড় দিয়ে রীতিমত ছিঁড়ে ফেলে। দু'দিন পর দেখা গেল কুকুরটির চামড়া খসে পড়ছে। গলিত মাংসের গন্ধ বেরুচ্ছে। কেউটে সাপ কুকুরটিকে কামড়েছিল। সাপের বিষে এমনটি হয়েছে। বাবা কুকুরের কষ্ট সইতে না পেরে গুলি করে মেরে ফেললেন। ঘটনাটি আমাকে প্রচণ্ড আহত করেছে। যে-কুকুর তাঁর ছেলের জীবন বাঁচাল তিনি সেই কুকুরকে নিজ হাতে গুলি করে মারলেন। সেই মনের কষ্টে কিছু একটা লিখেছিলাম। লেখার নাম সেই কুকুরটির নামে। সম্ভবত এটাই আমার প্রথম সাহিত্য।

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রথম উপন্যাস কবে. কোথায় লেখা?

উত্তর ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের হল জীবনে আমার লেখালেখি শুরু। আমি থাকতাম মহসীন হলের ৫৬৪ নম্বর রুমে। এখানেই রাত জেগে লিখে ফেলি আমার জীবনের প্রথম দু'টি উপন্যাস নন্দিত নরকে ও শঙ্খনীল কারাগার।

প্রশ্ন ঃ আপনি নিজের লেখা পড়ে প্রায়ই কাঁদেন। অন্যের লেখা কোনো বই পড়ে কাঁদেননি?

উত্তর ঃ প্রচুর কেঁদেছি। এখনো কাঁদি। সবচে বেশি কেঁদেছিলাম একজন নার্সের লেখা 'প্রাইভেট ওয়ার্ল্ড অব ডাইং চিলড্রেন' পড়ে। অনরবত চোখের পানি ফেলেছি। ক্যানসার হাসপাতালের একদল শিশুর জীবন নিয়ে লেখা এই বই।

প্রশ্ন ঃ লেখালেখির ক্ষেত্রে নিজের পরিশ্রমকে বিমল কর তুলনা করেছেন অনেকটা মজুরের মতো। আপনি তো অনেক লেখেন। আপনার এই দিন-রাত পরিশ্রমকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা যায়?

উত্তর ঃ আমি লেখালেখির জন্যে যত বেশি পরিশ্রম করি ঠিক তত বেশি আনন্দ পাই। এক-একটি লেখা শেষ করে আমি সন্তানলাভের মতো আনন্দ পাই। লেখালেখির পরিশ্রম আমাকে কখনোই কাবু করতে পারেনি। অন্তত মানসিকভাবে।

প্রশ্ন ঃ যদি কখনও টের পেয়ে যান, পাঠকের রুচি অনুযায়ী আর লিখতে পারছেন না, কি করবেন?

উত্তর ঃ খারাপ লাগবে, তবে লেখা থেমে যাবে না। আমি আজীবন লিখে যেতে চাই। মনে হয় লেখা ছাড়া আমি বাঁচবই না।

প্রশ্ন ঃ লেখায় সবসময় আপনি 'সেক্স' এড়িয়ে চলেন। এটা অনেকেই বলেন। কোনো কোনো সমালোচক বলেন, আপনার পাত্র-পাত্রীদের কাম-বাসনা নেই। আপনার

মন্তব্য?

উত্তর ঃ এই অভিযোগ ঠিক নয়। আমি একটি জীবনের চিত্র আঁকব কিন্তু সেই জীবনে 'সেক্স' থাকবে না, তা হলে লেখাই তো অপূর্ণ থেকে যায়। বাঙালিদের স্বাভাবিক একটা লজ্জাবোধ আছে। এটা চিরন্তন। আমি সবসময় আমার লেখালেখিতে এই সত্য মেনে চলতে চেষ্টা করি।

প্রশ্ন ঃ কেউ কেউ বলেন একটি ঘটনা নিয়ে সাধারণ মানুষ যা ভাবতে পারে, আপনার লেখায় ঠিক তার উল্টো ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়। আপনি কি কোনো কিছু সাধারণ মানুষের ভাবনার বিপরীতে ভাবতে পছন্দ করেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। তবে সব বিষয় কিংবা সব লেখালেখির ক্ষেত্রে এই দর্শন কাজ করে না।

প্রশ্ন ঃ ছোটবেলায় বাবা-মা'র হাতে খুব মার খেতেন নাকি? আপনার লেখায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বাবা-মা'র হাতে প্রচন্ড মার খায়।

উত্তর ঃ নিজেকে খেতে হয়নি। তবে খেতে দেখেছি। আমাদের সময় মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা বাবা-মা'র ভয়ংকর শাসনে বড় হত। এটা আমাকে প্রচণ্ড প্রভাবিত করেছে।

প্রশ্ন ঃ তসলিমা নাসরিনের কোনো লেখা পড়েছেন? কেমন লেগেছে? তাঁর লেখালেখি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই— কি দেশে কি দেশের বাইরে। বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখেন?

উত্তর ঃ তসলিমার কিছু কিছু লেখা আমি পড়েছি। প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক তাঁর লেখার ভঙ্গি। কাউকে অপমান করার প্রবণতা ওঁর লেখায় বেশি কাজ করে। আমাদের নবীকেও তিনি আক্রমণ করেছেন, এটা আমাকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছে। আমি কাউকে পছন্দ করি কি না-করি, তাই বলে কাউকে অপমান করার অধিকার নিশ্চয়ই কারো নেই। ধর্মে বিশ্বাস করি-না করি, কিন্তু কোনো ধর্ম বা ধর্মীয় প্রধানকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য কিংবা অপমান করা কোনো সচেতন লেখকের কাজ হতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ কোন লেখাকে আপনার লেখক জীবনের টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করেন?

উত্তর ঃ নন্দিত নরকে।

প্রশ্ন ঃ ভাগ্য বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে বলুন কোন লেখা আপনার সৌভাগ্যের সূচনা করেছে?

উত্তর ঃ আমার প্রথম ও দ্বিতীয় উপন্যাস নন্দিত নরকে এবং শঙ্খনীল কারাগার।

প্রশ্ন ঃ বেকনের যুক্তিতে কোনো জনপ্রিয় জিনিসই ভালো কিছু হতে পারে না। আপনার প্রতিক্রিয়া?

উত্তর ঃ জন স্টেইনব্যাক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। চার্লস ডিকেন্স, আমাদের শরৎচন্দ্রও অসম্ভব জনপ্রিয়। মান্না দে, হেমন্ত খুব জনপ্রিয় শিল্পী। পিকাসোর খ্যাতি পৃথিবীজোড়া। এসব যদি হতে পারে তবে নিশ্চয়ই দুঃখ পাবার কিছু নেই।

প্রশ্ন ঃ কবিতা পড়েন?

উত্তর ঃ জীবনানন্দ দাশের কবিতা খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে এখন আর আগের মতো ভাল লাগে না। শামসুর রাহমানও এখন পড়ি না। নির্মলেন্দু গুণ পড়ি।

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রথম প্রকাশিত রচনা কি?

উত্তর ঃ অনেকেই হাসবেন, ছাপার অক্ষরে আমার প্রথম প্রকাশিত রচনা একটি ইংরেজি কবিতা। তখন আমি বগুড়া জেলা স্কুলের ছাত্র। কবিতাটি স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল। আমার দ্বিতীয় প্রকাশিত রচনাও কবিতা। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। দুটো কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিই দৈনিক পাকিস্তানে (বর্তমানে দৈনিক বাংলা)। তবে নিজের নাম দিইনি। দিয়েছি ছোট বোনের নাম মমতাজ আহমেদ শিখু। এক সপ্তাহ পর পত্রিকায় ছাপা হল। দৈনিক পাকিস্তানের মহিলা পাতায় মমতাজ আহমেদ শিখু নামে ঐ দু'টি কবিতাই ছিলো পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রথম রচনা।

প্রশ্নঃ একজন ঔপন্যাসিক, নাকি একজন কবি—পাঠকদের মাঝে কার আবেদন দীর্ঘ সময় বলে মনে করেন?

উত্তরঃ একজন ঔপন্যাসিকের আয়ু অনেক কম, একটা সময় পর তিনি আর গৃহীত হন না। কিন্তু একজন কবি দীর্ঘ সময় ধরে পাঠকদের আন্দোলিত করতে পারেন। এদিক থেকে আমি অনেক ভাগ্যবান মনে করি কবিদের।

প্রশ্নঃ আপনি লেখালেখির কুড়ি বছর অতিক্রম করেও অসম্ভব জনপ্রিয় বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে। এই সময়কে কি যথেষ্ট মনে করেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ, করি। আমি কুড়ি বছর ধরে পাঠকদের আমার লেখায় আকৃষ্ট রাখতে পেরেছি, এটা আমার জন্যে কম সৌভাগ্যের নয়। আগামী কুড়ি বছরের আমাকে নিয়ে তাই আমি চিন্তিত নই।

সমাজ ও রাজনীতি

হুমায়ূন আহমেদ সাহিত্যচর্চা করেন 'আনন্দের জন্যে'; কিন্তু এই আনন্দ সমাজ এবং সমাজের বোধ, জাতি এবং জাতির বোধ, রাজনীতি এবং রাজনীতির বোধকে বাদ দিয়ে নয়। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ, সেজন্যে এই সমাজের কাছে তিনি দায়বদ্ধ; তাই এদেশের রাজনীতি তাঁর ভাবনার বিষয়। মওলানা ভাসানীকে তিনি অসাধারণ নেতা মনে করেন; ক্ষমতা ও রাজনীতিতে নারীনেতৃত্ব, গণতন্ত্রের দিকে মানুষের শোভাযাত্রা—সবই হুমায়ূন আহমেদকে বাংলাদেশ বিষয়ে আশা-ভরসায় বিশ্বাসী করে তুলেছে। বাংলাদেশকে তিনি মনে করেন অভিযাত্রিক এক দেশ, জাপানের মতো উন্নতি যেখানে সম্ভব। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কথা তিনি জানেন, দারিদ্র্য ও দুর্ভোগের কথা তিনি জানেন, মৌলবাদের উৎপাত এবং অন্যান্য নৈরাজ্যও তাঁর অজানা নয়; তবু হুমায়ূন আহমেদ আশা-ভরসায় আস্থাবান, তবু তাঁর মনে হয় বৃহৎ অন্ধকারের পর বিরাট সূর্যালোক নিশ্চয়ই আছে।

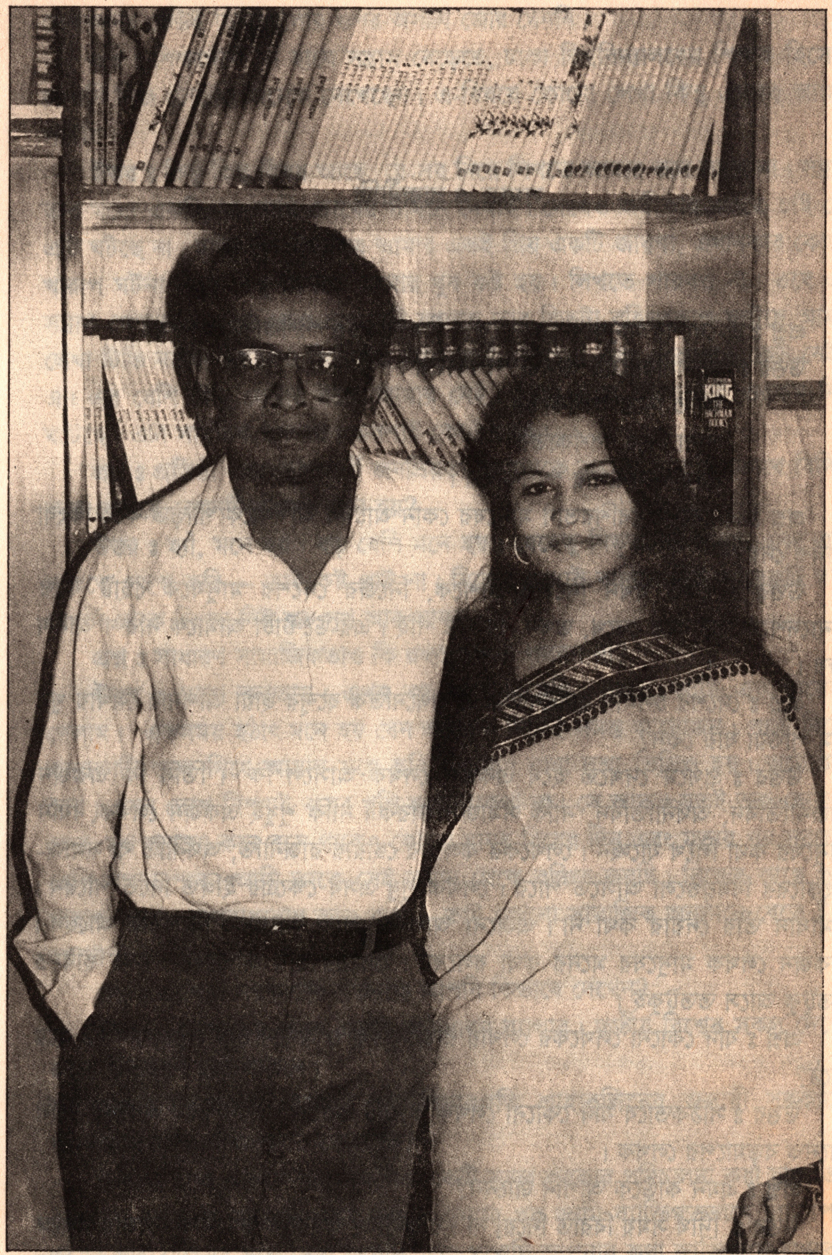

সস্ত্রীক হুমায়ূন আহমেদ

সমাজ ও রাজনীতি

প্রশ্ন : এ-দেশের মানুষকে কোন কোন বিষয়ে প্রচণ্ড স্পর্শকাতর মনে হয়?

উত্তর : অনেক বিষয়েই আমরা স্পর্শকাতর।

জাতি নিয়ে স্পর্শকাতর
ভাষা নিয়ে স্পর্শকাতর
প্রেম-ভালবাসায় স্পর্শকাতর।

প্রশ্ন : এ-দেশের বেশিরভাগ মানুষের কোন আচরণ আপনাকে পীড়িত করে কিংবা আনন্দ দেয়?

উত্তর : কেউ যখন নিজের দেশকে, নিজের দেশের মানুষকে ছোট করে অন্যদেশকে বড় করে দেখে, তখন খুব কষ্ট পাই। এর উল্টোটা আমাকে দারুণ আনন্দ দেয়।

প্রশ্ন : দেশের চলমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের ছায়া আপনার লেখায় খুব কম পাওয়া যায় কেন?

উত্তর : প্রথমে দেখতে হবে একজন লেখক আসলে কি । তিনি কি একজন রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, নাকি সমাজসংস্কারক। নাকি শুধুই একজন লেখক, যিনি মানুষের কথা লিখে যাচ্ছেন। লেখকের কলমের ছোঁয়ায় রাজনীতি, অর্থনীতি বা সমাজ-সংস্কারের বিষয়গুলো আসতে পারে। লেখক শুধু এসব ক্ষেত্রের ইঙ্গিত দিতে পারেন। সমাধান তাঁর দেয়ার কথা না। এজন্যে আলাদা লোক আছেন। বিশেষজ্ঞ আছেন। একজন লেখক মানুষের মনের কথা বলবেন। হৃদয়ের ছবি আঁকবেন। সেই ছবিতে যতটুকু আসে ততটুকুই।

প্রশ্ন : যদি কোনো লেখকের লেখায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে?

উত্তর : সঠিকভাবে যদি কোনো লেখক কাজটি করতে পারেন তবে অবশ্যই তিনি অনেক বড়মাপের লেখক।

প্রশ্ন : এমন কাউকে আপনি জানেন?

উত্তর : [দীর্ঘ সময় বিরতি নিয়ে] না। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-সংস্কার প্রসঙ্গে খুব জোর দিয়েছেন এমন কথাসাহিত্যিক আমার জানামতে নেই। আমার প্রিয়

লেখকদের কেউই বিষয়গুলোর ওপর অসম্ভব জোর দেননি।

প্রশ্ন : শিক্ষাঙ্গনে কি হারে সন্ত্রাস বেড়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আপনি নিজ চোখেও অনেক দেখেছেন। এ-বিষয়ে কোনো লেখা কিন্তু এখনও আমরা পাইনি।

উত্তর : কিছু কিছু বিষয় আছে, যে-সব নিয়ে লিখতে আমার ভাল লাগে না। সন্ত্রাস তার মধ্যে একটি, যা আমি চোখের সামনে দেখছি। দেখেও অস্বীকার করতে চাই যে, এটি ঘটছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার এতই প্রিয় একটি জায়গা, এখানকার কোনো খারাপ ঘটনা নিয়ে কিছু লিখতে আমার খুব কষ্ট হয়। লিখতে পারবও না। তবে এই সন্ত্রাস যে আমার মধ্যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে তার কিছুটা বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আমার লেখা টিভি নাটক 'মাটিরও পিঞ্জিরার মাঝে বন্দী হইয়ারে' এবং 'কোথাও কেউ নেই'-এ। এর বেশি কিছু লেখার ইচ্ছে আমার নেই। আমি ভুলে যেতে চাই ওরকম কিছু ঘটেছে। এটা সাময়িক ব্যাপার। অবশ্যই কেটে যাবে।

প্রশ্ন : প্রতিষ্ঠা এবং তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা আপনাকে ক্রমেই সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে, এমনটি কখনও মনে হয়?

উত্তর : হ্যাঁ, মনে হয়। বড় বেশি মনে হয়। যেহেতু নিভৃতচারী মানুষ, একা একা থাকতে পছন্দ করি— তাই কষ্ট পাই না। নিজের মধ্যেই বানিয়ে নিই আরেকটি ঘর। যেখান থেকে নিংড়ে নিই যত সুখ আর আনন্দ।

প্রশ্ন : সাধারণ সামাজিকতাও কি রক্ষা করতে পারেন না?

উত্তর : আগে করতাম। এখন বন্ধ করে দিয়েছি। ধরুন, আমি এক বিয়েতে গেলাম। একসময় হঠাৎ মনে হয় যেন আমাকে ঘিরেই সমস্ত আয়োজন। পাত্রী বিয়ের কান্নাকাটি ভুলে গিয়ে আমার সঙ্গে ছবি তোলে। নানা দৃশ্য ভিডিও হয়। অটোগ্রাফ নেয়। এসব দেখে নিশ্চয়ই বরের খুশি হওয়ার কথা না। সে আমার যতই ভক্ত হোক না কেন, মুখ শুকনো করে বসে থাকে। কোনো মানুষ বিয়ের দিন এবং মৃত্যুর পর সবচেয়ে বেশি সম্মান পান। আমি তাকে সেই সম্মান থেকে বঞ্চিত করছি। নিজের কাছে প্রচণ্ড খারাপ লাগে। অপরাধবোধ কাজ করে। তাই কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে ইচ্ছে হয় না।

প্রশ্ন : এরশাদ সরকারের পতনকে আপনি কিভাবে দেখেন?

উত্তর : এরশাদের পতন একটা অসাধারণ ব্যাপার। তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশের জন্যে উদাহরণ হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন : এরশাদের পতনের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের অস্থায়ী সরকারের শাসনকাল সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর : ইচ্ছে থাকলে বাংলাদেশেও একটি সুন্দর সরকার পরিচালনা করা যায়, তাই দেখলাম। অস্থায়ী সরকার থেকে বিদায় নেয়ার পর আমি ব্যাক্তিগতভাবে বিচারপতি জনাব শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেছি, এবং বলেছি আপনার কথা জাতি মনে রাখবে।

প্রশ্ন ঃ খালেদা জিয়ার বর্তমান শাসনকাল কেমন মনে হচ্ছে?

উত্তর ঃ হতাশ হবার মতো এখনও কিছু ঘটেনি। আমি আশাবাদী। খুবই আশাবাদী।

প্রশ্ন ঃ এ-দেশের সরকার প্রধান একজন মহিলা, বিরোধী দলীয় প্রধান এবং একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির প্রধান পদেও রয়েছেন মহিলা। এটি একটি বিরল ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে। ঘটনাটি আপনার মনে কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরি করে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, করে। জাতি হিসেবে আমরা আধুনিক—আমাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ নয়।

প্রশ্ন ঃ রাজনৈতিকভাবে কাকে বেশি প্রজ্ঞাবান মনে হয়—খালেদা জিয়া, নাকি শেখ হাসিনাকে?

উত্তর ঃ সময় নির্ধারণ করবে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা আছেন, তাঁরা ভাল বলতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ '৯১-এর সংসদ নির্বাচনে কাকে ভোট দিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ ভোটার তালিকায় আমার নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভোট কেন্দ্র থেকে ফিরে এসেছি।

প্রশ্ন ঃ কাকে ভোট দেয়ার কথা ভেবেছিলেন?

উত্তর ঃ খালেদা জিয়াকে।

প্রশ্ন ঃ কেন?

উত্তর ঃ তাঁর চেয়ে যোগ্য কাউকে খুঁজে পাইনি বলে।

প্রশ্ন ঃ আপনার কি মনে হয় না, ক্রমেই আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ সন্ত্রাসের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, মনে হয়। সন্ত্রাস বেশ ভালভাবে চেপে বসেছে আমাদের ওপর।

প্রশ্ন ঃ আগের চেয়ে বেড়েছে বলে মনে হয়?

উত্তর ঃ ভালভাবেই বেড়েছে।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙার পরও এদেশের মানুষ ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে দু'-একটা ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু রায়টে কেউ মারা গেছে বলে শুনিনি। আমি জোর দিয়ে বলব —সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের দেশে আছে।

প্রশ্ন ঃ মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং জিয়াউর রহমান সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত মন্তব্য জানতে চাইছি।

উত্তর ঃ মওলানা ভাসানী—অসাধারণ নেতা। স্বপ্নদ্রষ্টা। শেখ মুজিবর রহমান-জাতির পিতা। জিয়াউর রহমান—'বাংলাদেশ স্বপ্নের' রূপকার। স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক তিনি দিয়েছিলেন। বেতারে তাঁর ঘোষণায় রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ বঙ্গবন্ধুর বাকশাল গঠন কখনও কি যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত মনে হয়েছে?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ সিরাজ শিকদার এবং কর্নেল তাহেরের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ যে-কোনো হত্যাকাণ্ড আমি সমর্থন করি না। সিরাজ সিকদার ও কর্নেল তাহেরের মতো গুণী লোককে কেন হত্যা করা হল এটা বের করার দায়িত্ব ইতিহাসবিদ, সমাজবিদ ও রাজনীতিবিদদের। একটি সুস্থ সমাজগঠনের জন্যেই এটি প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ সামরিক লোকজনদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কিংবা দেশের শাসনভার গ্রহণকে কিভাবে দেখেন?

উত্তর ঃ আমি সমর্থন করি না।

প্রশ্ন ঃ অনেক সমালোচক-বুদ্ধিজীবী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাজাকারদের ক্ষমা করেছেন আর জিয়াউর রহমান তাদের পুনর্বাসিত করেছেন। আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ আমারও তাই—মনে হয়। মুক্তিযোদ্ধা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময়ই শর্ষিনার পীর সাহেব স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন, যিনি পাক হানাদার বাহিনীকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ ফ্রিডম পার্টি এবং জামায়াতের রাজনীতি সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ এরা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি করছে। ধর্মের অপব্যাখ্যা করছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

প্রশ্ন ঃ এরশাদ আবার কখনও রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে অবাক হবেন?

উত্তর ঃ এ-দেশের রাজনীতিতে কী-না সম্ভব। তবে মানুষ অত বড় ভুল হতে দেবে না বলেই বিশ্বাস করি।

প্রশ্ন ঃ দেশের ক্ষমতায় গোলাম আযমকে ভাবতে কেমন লাগে?

উত্তর ঃ এ-দেশের মানুষের কাছে 'রাজাকার' শব্দটি অত্যন্ত ঘৃণিত। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকার কারণে গোলাম আযমকে মানুষ এই জীবনে অন্তর থেকে ক্ষমা করতে পারবে না। এমন একজনকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আমি কল্পনাও করতে পারি না।

প্রশ্ন ঃ মুক্তিযুদ্ধে যারা পাকিস্তানকে সাপোর্ট করেছেন, তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। কিন্তু ইস্যুটি সেখানেই শেষ হয়ে যায়নি। ক্রমেই রাজাকারদের প্রতি মানুষের ঘৃণা তীব্রতর হচ্ছে এবং একটি জটিল জাতীয় সমস্যা তৈরি হচ্ছে। বিষয়টিকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর ঃ মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা পাকিস্তানকে সাপোর্ট করেছেন তাঁদের মধ্যে আমার নানাও একজন, যিনি মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মারা গেছেন। আমার নিজের একজন মামাও আছেন, যিনি মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মারা গেছেন। আমার এই নানার মতো, মামার মতো ভদ্রলোক, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত এত পরিপূর্ণ ভদ্রলোক এই জীবনে দেখিনি। আমার নানা একটি আদর্শ নিয়ে বড় হয়েছেন। একটি পূর্ণ মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন। কারণ বড় হওয়ার সময় তাঁরা ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের দ্বারা প্রচণ্ড নির্যাতিত হয়েছিলেন। কোনো মিষ্টির দোকানে গেলে তাঁদের প্লেটে করে মিষ্টি দেয়া হত না।

তাঁরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁদের হাতে দেয়া হত। এটা শুধু মুসলমানদের সঙ্গেই না, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গেও করত। এটা ছিল হিন্দুদের ক্লাস সিস্টেম। এসব দেখে দেখে সে-সময়ের মুসলমানরা বড় হয়েছেন এবং তাঁদের মনে হয়েছে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রয়োজন। অনেক যুদ্ধের পর তাঁরা তা পেয়েছেন। যখন তাঁরা দেখলেন চোখের সামনে দিয়ে সেই রাষ্ট্র ভেঙে যাচ্ছে, তখন তাঁরা মনে করেছেন আবার হিন্দু রাজত্ব শুরু হয়ে যাবে। তখন পাকিস্তানকে সাপোর্ট করা শুরু করেন। কিন্তু পাকিস্তান আর্মির অন্যায়গুলো ক্রমেই চোখে পড়তে থাকে। তাঁরা দেখলেন পাকিস্তানি আর্মিরা তো কেবল হিন্দু মারছে না, সমানে মুসলমানদেরও খুন করছে। আমার নানা দেখলেন, তাঁর অতি আদরের বড় মেয়ের পুলিশ অফিসার স্বামীকে (আমার বাবা) বেঁধে নিয়ে আর্মিরা গুলি করে মেরে ফেলল। তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। কি হচ্ছে এসব? কোনদিকে যাবেন? তিনি কি পাকিস্তান আর্মির সঙ্গেই থাকবেন, নাকি এসে কমন যে স্রোত আছে তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন? এই নিয়ে কনফিউশন তৈরি হল তাঁর মধ্যে। তিনি এই কনফিউশন দূর করতে পারলেন না। এক্ষেত্রে তাঁর যেমন দোষ ছিল, আমাদেরও ছিল। কারণ, আমরা তাঁদের বোঝাতে পারিনি। কনফিউশন দূর করাতে পারিনি। তিনি মারা গেলেন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। এখন আমরা তাঁকে ক্ষমা করব কি করব না সেই প্রশ্ন। শেখ মুজিব সাহেব তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি ক্ষমার পক্ষপাতী। কারণ, আমার হাতে একটি বড় প্রমাণ আছে। যখন জার্মান আর্মি (নাৎসী বাহিনী) আক্রমণ করল নেদারল্যান্ড এবং অত্যাচার শুরু করে দিল, তখন নেদারল্যান্ডের বিশ্বখ্যাত লেখক নুট হামসুন সমর্থন করলেন হিটলারকে। নুট হামসুন অসম্ভব বড় মাপের লেখক। নোবেল পুরস্কার পাওয়া তাঁর মতো লেখক পৃথিবীতে খুব কম জন্মেছেন। নুট হামসুনের মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যুর খবর নিজ দেশের কোনো মিডিয়াতে প্রচার করা হয়নি। অথচ সারা বিশ্ব থেকে প্রচারিত হয়। নিজের দেশে নুট হামসুন অতটাই ঘৃণিত ছিলেন হিটলারকে সমর্থনের কারণে। আমার কথা হচ্ছে নুট হামসুন তো সাধারণ মাপের মানুষ নন। তিনি যদি ভুল করতে পারেন, তবে আমাদের এইসব সাধারণ মানুষেরা কি ভুল করতে পারেন না? তাঁরাও ভুল করেছেন। যে-কেউ ভুল করতে পারে। কিন্তু এই ভুলের জন্যে তাদের পুরো পরিবারকে আলাদা করে রাজাকার হিসেবে অভিহিত করা হলে জাতি দু'ভাগ হয়ে যাবে। বংশপরম্পরায় তাদের সংখ্যা বাড়বে এবং জাতির সামনে ভয়াবহ এক সমস্যা তৈরি হবে। জাতিকে এই ভয়াবহ সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজি নই। তবে একটি কথা— জাতির কাছে রাজাকারদের হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে হবে। আমরা তাদের ক্ষমা করে দেব, কিন্তু তারা যদি মনে করে তারা কোনো অপরাধ করেনি, তা হয় না। তাদের প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

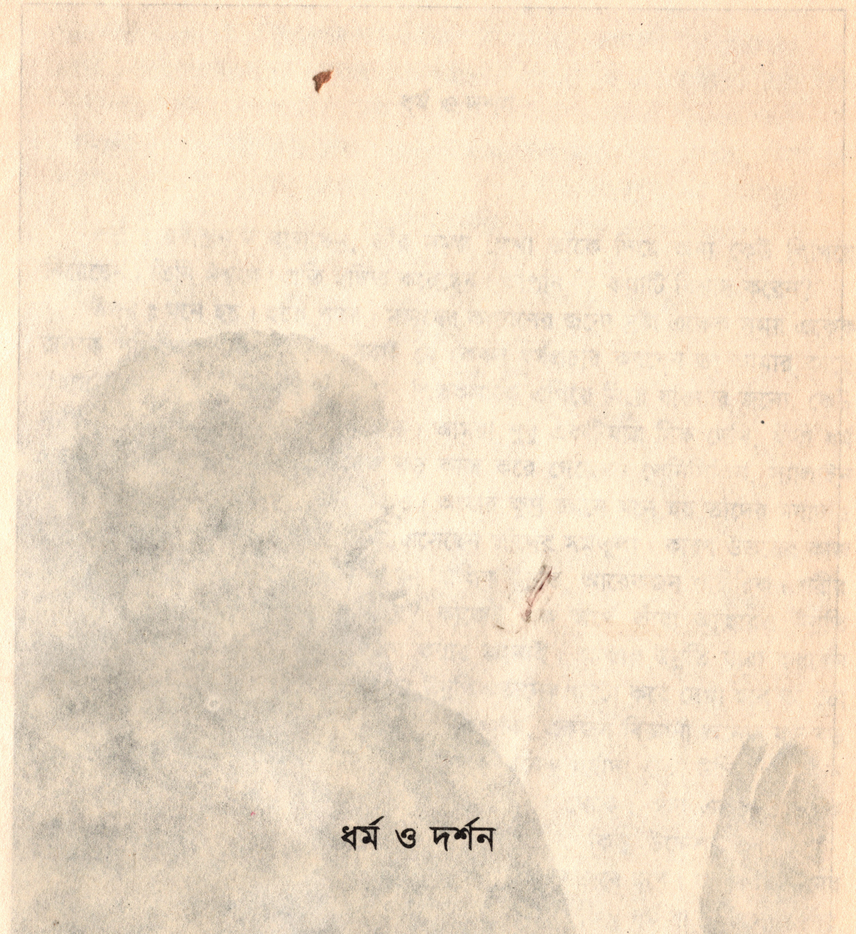

ধর্ম ও দর্শন

হুমায়ূন আহমেদ মানবজীবনকে অর্থপূর্ণ মনে করেন। তিনি যুক্তিশীল এবং জিজ্ঞাসু, কিন্তু নাস্তিকতাকে যুক্তি কিংবা জিজ্ঞাসার একমাত্র গন্তব্য মনে করেন না। মৃত্যুকালে টলস্টয়ের পকেটে কেন "সেইংস্ আব দি প্রফেট" বইটি ছিল; হুমায়ূন আহমেদ ভাবতে চান; এবং অন্যদের ভাবতে বলেন। ধর্মবিষয়ে হুমায়ূন আহমেদ নিজের বিশ্বাসের কথা বলেছেন উচ্ছ্বাসমুক্ত ভঙ্গিতে, এবং কারো মনরক্ষা করেননি। হুমায়ূন আহমেদের গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, কথকতায় যে-নীতি ও নৈতিকতার আভাস-ইঙ্গিত আছে, গ্রন্থের এই পরিচ্ছেদের মধ্যে তা মিলিয়ে পড়লে বুঝতে সুবিধে হবে। এই পরিচ্ছেদ হুমায়ূন আহমেদের সততা ও সত্যকথনের বড়ো দৃষ্টান্ত।

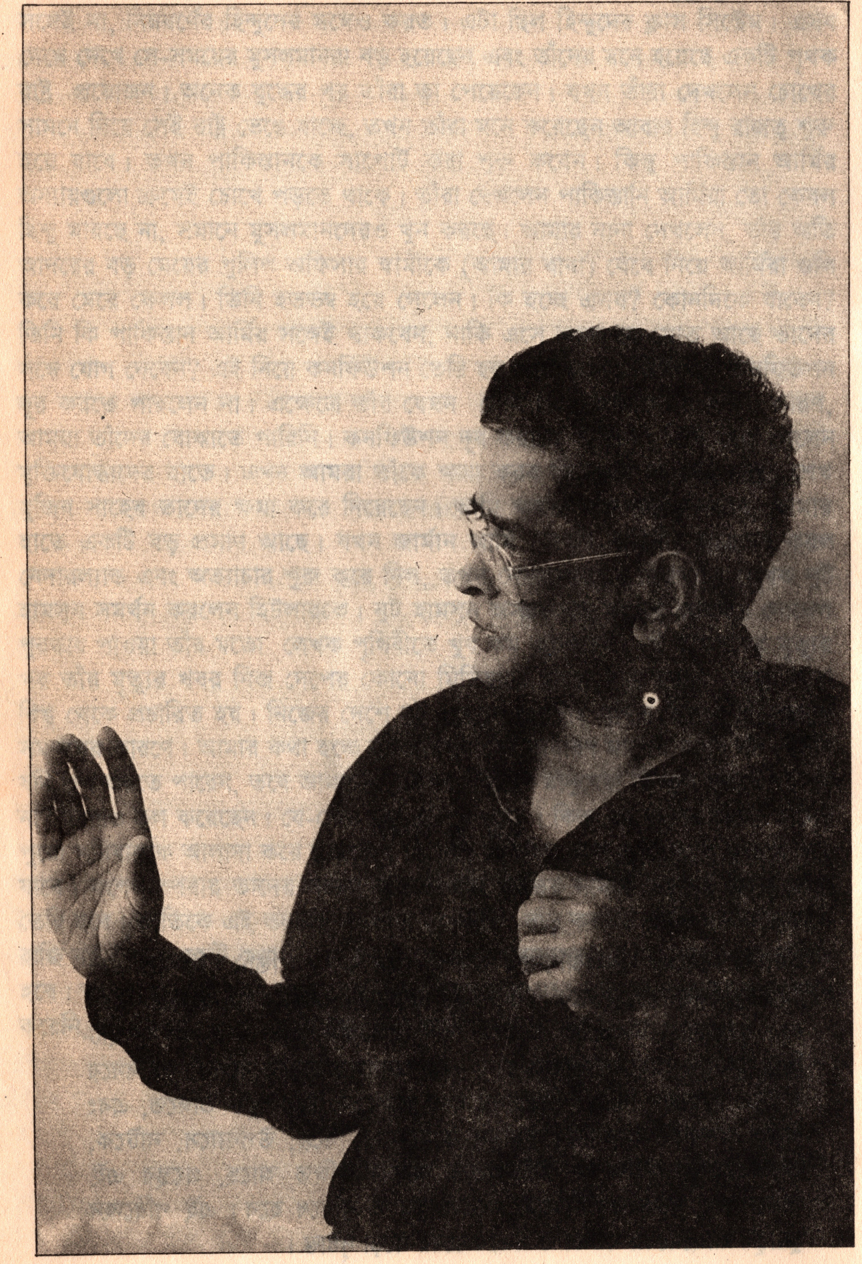

ধর্ম ও দর্শন

প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর সমস্ত লেখা তাঁকে দিয়ে অন্য কেউ লিখিয়ে নিয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আপনি কি কথাটি বিশ্বাস করেন?

উত্তর ঃ মনে হয়। হতে পারে। মানুষের কল্যাণের জন্যে স্রষ্টা একেক সময় একেক জনকে পৃথিবীতে পাঠান। এঁরা সবাই যে কেবল ধর্মপ্রচার করবেন তা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। কেউ আসেন শিল্পকলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, কেউ সাহিত্য, কেউবা চিকিৎসাবিশারদ হয়ে। আমরা শুধু একটিমাত্র দিক দেখি, যাঁরা ধর্ম প্রচার করছেন। রবীন্দ্রনাথও অনেক বড় কাজ করে গেছেন। পেনিসিলিন, স্যালাইন ইত্যাদি যাঁরা আবিষ্কার করেছেন তাঁরাও। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয় তাঁদের মর্যাদাও যুগে যুগে খোদার পয়গাম্বর হয়ে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সমতুল্য। কারণ উভয়ের কাজ একটাই— মানবকল্যাণ। একজন করেন আত্মিক উন্নতি, আরেকজন শারীরিক। শরীর যদি না থাকে আত্মা কোথায় থাকবে? কাজেই এক অর্থে তাঁরা আত্মারও উন্নতি করছেন। শরীরটা তো আত্মাকে ধারণ করার জন্যেই। আত্মার উন্নতি যাঁরা করছেন তাদের বড় করে দেখা হবে আর শরীরের উন্নতিকর্তাদের খাটো করে দেখা হবে তা তো হয়না। সমানভাবে দেখতে হবে। একজন চিকিৎসক, একজন বিজ্ঞানী অনেক বড় বড় কাজ করে যাচ্ছেন। গড অলমাইটি'র কাছে তাঁর অনেক মর্যাদা থাকা উচিত। একজন বিজ্ঞানী সৃষ্টির রহস্য অনুসন্ধান করেন বিজ্ঞানের দিক থেকে। আর একজন ধার্মিক করেন ধর্মের দিক থেকে। দু'জন দু'লাইনে এগুচ্ছেন, কিন্তু উদ্দেশ্য একটাই— মানবকল্যাণ। বিজ্ঞান থেকে যেটা হচ্ছে সেটা আরও সুন্দরভাবে হবে। কারণ বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট সেট-রুলস আছে। এই নির্দিষ্ট পথেই এগুতে হবে। কিন্তু ধর্ম বা বিশ্বাসের ওপর ভর করে যারা এগুচ্ছেন তাঁদের নির্দিষ্ট কোনো সেট-রুলস নেই। একেকজন একেক পথে এগুচ্ছেন। গড অলমাইটি রুলস পছন্দ করেন। তিনি লজিক পছন্দ করেন। তাঁর সমস্ত সৃষ্টি লজিকের ওপর। কাজেই তাঁকে পেতে হলে লজিকের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হয়না ইল্‌লজিক বা ব্যাডলজিকের মধ্য দিয়ে তাঁকে পাওয়া যাবে।

মানব-সন্তানকে সবচেয়ে অসহায় করে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। কিন্তু তার ভেতরে এমন একটা জিনিস ঢুকিয়ে দেয়া হল যেন সবাই শিশুটিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু একটা কুকুর, বিড়াল, বা গরুর বাচ্চার মা বাচ্চাটাকে যত্ন করতে পারবে না--এটা গড অলমাইটি দেখলেন। কারণ কুকুর, বিড়াল বা গরুর ব্রেন ডেভেলপ্‌ড্ না। কাজেই এরা জন্মের পরই জেনে যায় কিভাবে দুধ খেতে হবে। তাদের যত্নের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষের বাচ্চাকে টেক-কেয়ার করতে হয়। বানরের বাচ্চাকে করতে হয়। কারণ

বানরকেও সেই বুদ্ধি দিয়েছেন অলমাইটি। একটি মানবশিশু দু'বছর মায়ের দুধ খাবে এবং ঠিক দু'বছরই মায়ের শরীরে দুধ আসছে বাচ্চার জন্যে। সবকিছুই যেন সেট করা। এত নিখুঁতভাবে এই হিসেব দেখে মনে হয় গড অলমাইটি অসম্ভবরকম লজিক্যাল। কিন্তু আমরা বেশিরভাগ মানুষই আল্লাহ্‌কে অনুসন্ধান করি লজিকটা বাদ দিয়ে। এখন ধর্মের ব্যাপারে আচারগত দিকটাই প্রধান হয়ে গেছে। লম্বা দাড়ি, লম্বা কুর্তা, চোখে সুরমা দেয়া এসবকে প্রধান করে দেখা আমার মনে হয় ঠিক না।

প্রশ্ন ঃ দার্শনিক হিসেবে ইমাম গাজ্জালিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উত্তর ঃ ইমাম গাজ্জালির একটিমাত্র গ্রন্থই আমি পড়েছি 'কিমিয়ায়ে-সাদত'। এর ওপর ভিত্তি করে কোনো মতামত দেয়া ঠিক হবে না। তবে পৃথিবীতে অনেক মহান দার্শনিক এসেছেন। আমার মতে বড় বড় লেখক, শিল্পী এবং বিজ্ঞানীরা দার্শনিক। প্রত্যেকে তিনটি প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন—

আমরা কে?

আমরা কোথা থেকে এসেছি?

আমরা কোথায় যাবো?

এই খোঁজার চেষ্টা সভ্যতার উষালগ্ন থেকে শুরু হয়েছে। এখনও চলছে। যতদিন পৃথিবী থাকবে, ততদিন চলবে। ইমাম গাজ্জালি সেই উত্তর দিতে চেয়েছেন। তিনি মহান দার্শনিকদের একজন। এর বেশি কিছু তো বলতে পারছি না।

প্রশ্ন ঃ ইমাম গাজ্জালি বলেছেন, কেউ যদি তোমার সমালোচনা করে, তবে জেনে নাও সে কি এটা করছে ঈর্ষা থেকে, বোকামো থেকে, নাকি সূক্ষ্ম জিনিস বোঝে না বলে? গাজ্জালি নিজেকে দিয়ে উত্তরগুলো দিয়েছেন এভাবে— যদি আমাকে ঈর্ষা থেকে প্রশ্ন কর আমি এর জবাব দেব না। কারণ ঈর্ষার কোনো শেষ নেই। মূর্খতা থেকে যদি প্রশ্ন কর, আমি তারও জবাব দেব না। কারণ হযরত ঈসা (আঃ) অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছিলেন, কিন্তু বোকাকে বুদ্ধিমান বানাতে পারেননি। আর যে সূক্ষ্ম জিনিস বোঝে না, তাকে বোঝাতে গিয়ে আমি কখনও পন্ডশ্রম করব না। কারণ সূক্ষ্ম জিনিস সবার বোঝার কথা না। আমি কেবল তাদের সঙ্গেই বিতর্কে যাব, প্রশ্নের জবাব দেব— যারা বুদ্ধিমান এবং সূক্ষ্ম জিনিষ বোঝার আগ্রহ আছে।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে নিয়ে বিভিন্ন তীর্যক সমালোচনার ক্ষেত্রে আপনি কি ইমাম গাজ্জালির এই পথ অনুসরণ করেন?

উত্তর ঃ ইমাম গাজ্জালির এই চমৎকার উক্তি আমি এখন জানলাম। এখন থেকে হয়ত আমাকে পথচলায় সাহায্য করবে।

প্রশ্ন ঃ আপনার অনেক লেখায় এবং নাটকে জায়নামাজ, কোরআন শরীফ, তসবীহ্‌ এসবের উপস্থিতি দেখা যায়। ধর্মের প্রতি দুর্বলতা থেকেই এটি করেছেন, নাকি লেখার জন্যে লেখা?

উত্তর ঃ আমি যখন লেখায় একটি মুসলমান পরিবারের কথা বলি, সঙ্গে সঙ্গে

তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাও দেখাতে চাই। মুসলমান পরিবারে জায়নামাজ থাকে। কোরআন শরীফ থাকে। পরিবারের প্রধানরা নামাজ পড়েন। রোজা রাখেন। কেউ কেউ ভোরবেলায় কোরআন তেলওয়াত করেন। আমি আমার লেখায় এসব দেখাব না কেন? যদি না দেখাই, তা হলে তো আমার আঁকা সংসারের ছবি পূর্ণ হবে না। অপূর্ণ রয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ এ-দেশের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজে যাঁরা আছেন, তাঁদের কার্যক্রম খুব একটা পরিষ্কার না। এঁরা কেন জানি ইসলাম ধর্মকে খুব ছোট করে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান অন্য যে, কোনো ধর্মের প্রায় সব উৎসবে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত থাকেন— বক্তৃতা করেন, বাণী দেন— কিন্তু ইসলামী কোনো জলসায় এঁদের কেউ উপস্থিত থেকেছেন বলে শোনা যায় না। তাঁদের মতে ইসলামি জলসায় কেউ উপস্থিত থাকা মানে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিও নিম্নমানের। সে একজন প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক লোক। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কাছে হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টানদের কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অর্থ মুক্তবুদ্ধির চর্চা করা, প্রগতির চর্চা করা, সংস্কারমুক্ত হওয়া ইত্যাদি। প্রফেসর সালাম ঢাকায় এসে যখন বক্তৃতার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বললেন, তখন আমাদের বুদ্ধিজীবীরা হকচকিয়ে গেলেন। কারণ, তাঁদের কাছে প্রগতিশীল হওয়া, বুদ্ধিজীবী হওয়া, মুক্তবুদ্ধির চর্চা করা মানেই ইসলামবিরোধী হতে হবে। তাঁদের কাছে রামকৃষ্ণের বাণী, বিবেকানন্দের বাণী, যিশুর বাণী সবই গ্রহণীয়, এসব তাঁরা উদাহরণ হিসেবেও ব্যবহার করেন, কিন্তু হযরত মোহাম্মদের বাণী কখনও তাঁদের মুখ থেকে শোনা যায় না। তাঁদের কাছে হযরত মোহাম্মদের বাণী গ্রহণযোগ্য নয়। আমার মতে পৃথিবীর তাবৎ ঔপন্যাসিক যাঁর কোটের পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছেন তাঁর নাম দস্তয়ভস্কি। আরেকজন আছেন মহামতি টলস্টয়। এক রেলস্টেশনে যখন টলস্টয় মারা গেলেন, তখন তাঁর ওভারকোটের পকেটে একটি বই পাওয়া গেছে, তার নাম SAYINGS OF PROPHET বইটি ছিল টলস্টয়ের খুব প্রিয়। সবসময় সঙ্গে রাখতেন। সময় পেলেই পড়তেন। বইটিতে হযরত মোহাম্মদের বিভিন্ন সময়ে বলা ইন্টারেস্টিং কথাগুলো গ্রন্থিত। আমি বিনয়ের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কাছে জানতে চাইছি আপনাদের ক'জন বইটি পড়েছেন। টলস্টয় যে-বইটি পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন সেই বই আমাদের প্রত্যেকের একবার কি পড়া উচিত নয়? আমার মতে প্রতিটি শিক্ষিত ছেলেমেয়ের বইটি পড়া উচিত।

প্রশ্নঃ আপনার কোনো কোনো লেখা পড়ে মনে হয় আপনি নাস্তিক। আবার কোনো লেখায় মনে হয় আস্তিক। সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি আপনার প্রচুর লেখায় পাওয়া যায়। এতে পাঠকরা আপনার সম্পর্কে বিভ্রান্ত হতে পারেন। বিষয়টি খুলে বলবেন?

উত্তরঃ আমি আস্তিক। তবে মাঝে মাঝে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসে আক্রান্ত হই না— তা না। আধুনিক মানুষের এই এক সমস্যা।

প্রেম ও সৌন্দর্য

হুমায়ূন আহমেদ সৌন্দর্যের মূল্য দেন অনেক বেশি এবং সৌন্দর্য তাঁর চোখে বড়ো কথা। বলেছেন, তিনি সৌন্দর্যে অভিভূত এবং সুন্দরীর খুঁত ধরতে তাঁর লজ্জা হয়। তাঁর চোখে 'সুন্দরীরা' রূপবতী, অসুন্দরীরা মায়াবতী। মামার নির্দেশে হুমায়ূন আহমেদ এক তরুণীকে প্রেমপত্র পৌঁছে দেন, কিন্তু ঐ মেয়ে অন্য একজনের ঘরে চলে যায়; বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে মেয়েরা পাত্তা দিত না বলে তিনি তাদের নিয়ে প্রচণ্ড ঠাট্টা করতেন; স্ত্রীর বাইরে আর কেউ তাঁকে প্রেম নিবেদন করেছে কি না তিনি নিশ্চিত নন; এরকম এক এবং একাধিক তথ্য হুমায়ূন আহমেদ জানিয়েছেন অকপটে। কোনো কোনো কথা এই প্রথম বোধহয় বললেন। বোধহয় অনেক কৌতূহল নিবৃত্ত হবে এবার।

মন্টানায় হুমায়ূন আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী

প্রেম ও সৌন্দর্য

প্রশ্ন ঃ বিয়ের সময় আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর আপনার স্ত্রী স্কুলছাত্রী। বলা যায় নাবালিকা। বিষয়টি আপনাকে বিব্রত করেছে কখনও?

উত্তর ঃ যেখানে ভাললাগার ব্যাপার, ভালবাসার ব্যাপার। সেখানে খানিকটা বিব্রত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনার মেয়েরা এখন স্কুল-কলেজে পড়ছে। তাদের কারো বেলায় যদি এমনটি ঘটে?

উত্তর ঃ আমি আমার সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা এবং স্বাধীনতার মাধ্যমে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি। ওরা বড় হচ্ছে। আস্তে আস্তে সবকিছু বুঝতে শিখছে। যে-কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

প্রশ্ন ঃ আপনার উপন্যাসে এবং নাটকে রূপবতী নায়িকার সঙ্গে সবসময় দেখা যায় অত্যন্ত সাদামাটা পুরুষকে। এক লেখায় আপনি বলেছেন, রূপবতী নায়িকার ব্যাপারটি এসেছে আপনার সুন্দরী স্ত্রীর সাহচর্য থেকে। আপনাকে যারা দেখেছেন, তাঁদের মতে আপনি সুদর্শন·নন। তবে কি উপন্যাস কিংবা নাটকের সাদামাঠা পুরুষ চরিত্রগুলো আপনার প্রতিবিম্ব?

উত্তর ঃ হতে পারে। কারণ, প্রত্যেক লেখকের লেখায় সচেতন বা অবচেতনভাবে লেখকের নিজস্ব ছায়া পড়ে। 'অপু' বিভূতিভূষণের লেখায় বারবার এসেছে। এই 'অপু' কিন্তু তিনি নিজে। এটা মেনে নিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করছি না যে আমি দেখতে সুদর্শন নই। তবে কুদর্শনও নই। আমি অত্যন্ত সাদামাটা চেহারার একজন পুরুষ।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখার রূপবতী নায়িকাদের বর্ণনার ব্যাপারে স্ত্রীর সাহচর্য থেকে অনুপ্রাণিত হন বলে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এও বলেছেন পরবর্তীতে এ-ব্যাপারে আপনার মেয়েদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নেবেন। আপনার বড় মেয়ে এখন কলেজে পড়ছে। ওদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে শুরু করেছেন?

উত্তর ঃ না, এখনও সেভাবে গ্রহণ করিনি।

প্রশ্ন ঃ আপনার অনেক মেয়ে ব্যাচমেট বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আপনি মেয়েদের নিয়ে নানা রসিকতা করতেন। এটা-ওটা নামে ডেকে খ্যাপাতেন। এতে কি

কখনও কোনো অঘটন ঘটেছিল?

উত্তর ঃ না, অন্তত আমার জানা মতে ঘটেনি। আমি সবসময়ই রসিকতা করি। কাজেই ওসব তারা সহজভাবেই নিয়েছিল বলে আমার মনে হয়।

প্রশ্ন ঃ মেয়েদের নিয়ে বেশি রসিকতা করতেন কেন?

উত্তর ঃ ওরা আমাকে পাত্তা দিত না তো, তাই।

প্রশ্ন ঃ এর পেছনে কোনো কারণ ছিল বলে মনে হয়েছে কখনও?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। মেয়েদের পেছনে ঘুরঘুর করার মতো কোনো গুনাবলী (!) আমার ছিল না।

প্রশ্ন ঃ গুলতেকিনের আগে কিংবা পরে কোনো মেয়ে আপনাকে প্রেম নিবেদন করেছে?

উত্তর ঃ আমি তেমন একটা টের পাইনি। চেষ্টা ও করিনি। হয়ত অনেকে করেছে। হয়ত কেউই করেনি। আমার যে চেহারা, পোশাক-আশাক আর কথা বলার ভঙ্গি তাতে না করারই কথা।

প্রশ্ন ঃ আপনি প্রেমের উপন্যাস বা গল্প কম লেখেন বলে আপনার পাঠকদের অভিযোগ।

উত্তর ঃ কম লিখি তা না। আমার লেখায় রোমান্টিসিজম আছে। তবে যে অর্থে নারী-পুরুষের প্রেম-ভালবাসা, তা হয়ত কম। এটা অভিজ্ঞতার অভাবেও হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু বিয়ে তো প্রেম করে।

উত্তর ঃ পার্ক রেস্তোরাঁয় ঘুরে বেড়ানোর মতো কিছু ছিল না। আমাদের পরিচয় ছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। স্কুল-পড়ুয়া একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসত। করিডোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনারা আলাপ করতেন। সে মেয়েটি এখন আপনার সন্তানের মা।

উত্তর ঃ সে বেশিদিন ক্যাম্পাসে আসেনি। বড়জোর দু'-চার দিন।

প্রশ্ন ঃ এই দু'-চারদিনে ছাত্রছাত্রীদের সামনে কখনও বিব্রত হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ আমাদের সময় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এখনকার মতো ছিল না। ছাত্রছাত্রীরা পর্যন্ত একে অন্যকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করত।

প্রশ্ন ঃ প্রেম-ভালবাসা সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত মতামত কি?

উত্তর ঃ প্রেম হল মানবিক আবেগের শুদ্ধতম রূপ।

প্রশ্ন ঃ নারীর সৌন্দর্য সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত উপলব্ধি কি?

উত্তর ঃ মেয়েদের দৈহিক রূপের প্রতি আমার আকর্ষণ তীব্র। এটা আমার চরিত্রের একটি দুর্বল দিক। যে মেয়ে দেখতে সুন্দর না, সে হাজারো ভাল হলেও আমাকে আকর্ষণ করতে পারে না। বলা যায় সুন্দরীদের বেলায় আমি একেবারে অন্ধ। ওদের কোনো ভুলত্রুটি আমি খোঁজার চেষ্টা করি না। দৈহিক সৌন্দর্যই আমাকে অভিভূত করে রাখে।

প্রশ্ন ঃ শৈশবে কারও লেখা প্রেমপত্র পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পড়েছিল?

উত্তর ঃ ভালভাবেই পড়েছিল। আমার বড় মামা এক তরুণীর প্রেমে পড়লেন। প্রেমের আবেগে অনেক কবিতা লিখলেন তিনি। আমার দায়িত্ব ছিল সকল কবিতা ঐ তরুণীর কাছে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে পৌঁছে দেয়া। বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে আমি সেই দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বড় মামার— সেই তরুণী অন্য এক ছেলেকে বিয়ে করে ফেলে।

প্রশ্ন ঃ আপনার এই মামার সঙ্গে আপনার লেখা টিভি ধারাবাহিক 'বহুব্রীহি'র মামা চরিত্রের প্রচুর মিল রয়েছে বলে শুনেছি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমার বড় মামা ছিলেন অনেকটা তাই। অসম্ভব এক মজার চরিত্র।

প্রশ্ন ঃ জীবনের প্রথম প্রেমের কথা বলবেন?

উত্তর ঃ না, বলব না।

প্রশ্ন ঃ কাম ও প্রেম সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ প্রেম সম্পর্কে আগেই বলেছি। কাম সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। এটি প্রকৃতির শৃঙ্খল।

প্রশ্ন ঃ কাম ও প্রেমের সহাবস্থান কি অপরিহার্য?

উত্তর ঃ প্রেমহীন কাম যেমন কারো কাম্য হতে পারে না তেমনি কামবিহীন প্রেমেরও অস্তিত্ব নেই। তবে অবশ্যই এটা সব সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনার স্ত্রী যদি অন্য পুরুষের প্রেমে পড়েন এবং এই সংসার ছেড়ে চলে যান, কি করবেন?

উত্তর ঃ স্বাধীনতা তো মানুষের জন্যেই। সচেতন এবং বিবেচকও একমাত্র মানুষই। কাজেই অঘটন ঘটে গেলে চোখ বড় বড় করে দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমার কি-ইবা করার আছে।

প্রশ্ন ঃ আপনার হিউমার প্রচণ্ড শার্প। এতে অভিভূত হয়ে কোনো বিশ্বসুন্দরী যদি আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়?

উত্তর ঃ কোনো বিশ্বসুন্দরীর সামনে হিউমার যাচাইয়ের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আর প্রচণ্ড সুন্দরী কাউকে দূর থেকে দেখাই বোধহয় নিরাপদ।

প্রশ্ন ঃ আপনার কপালে যদি বড়ি বিল্ডার স্ত্রী জুটত, কি করতেন?

উত্তর ঃ প্রশ্নের ধারা বুঝতে পারছি না। রসিকতা করার চেষ্টা হচ্ছে কি?

প্রশ্ন ঃ আপনার অসংখ্য মেয়ে ফ্যান। এদের বয়সের কোনো বালাই নেই। এরা সবাই মিলে যদি আপনাকে কোনো নির্জন দ্বীপে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে চায়, তবে সঙ্গী হিসেবে অন্য কাউকে চাইবেন?

উত্তর ঃ আমি যেতে রাজি হলেই সে প্রশ্ন আসে।

প্রশ্ন ঃ ঘরে ফেরার তাড়া আপনার খুব বেশি নাকি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে আমি বেশিদিন থাকতে পারি না।

প্রশ্ন ঃ পরকীয়া প্রেম সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ প্রেম প্রেমই। তবে প্রেমের ব্যাপারেও আমার কিছু শুচিবাই আছে।

প্রশ্ন ঃ অসম প্রেম আপনার লেখায় দেখা যায়। অসম প্রেম সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ অসম প্রেম এই সমাজে আছে বলেই আমি লিখি।

প্রশ্ন ঃ চেয়ে না পাওয়া হচ্ছে 'প্রেম' আর পাওয়া হল 'কাম'। প্রেম ও কাম সম্পর্কে একজন বিখ্যাত লোক এ-কথা বলেছেন। আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ আমার তা মনে হয় না।

প্রশ্ন ঃ কি মনে হয়?

উত্তর ঃ আগে একবার এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ আজকাল বলা হচ্ছে যৌন পরিতৃপ্তি বা বিনিময়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশই প্রেম। এর সঙ্গে আপনি কি একমত?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ নরনারীর অস্বাভাবিক সম্পর্ক নিয়ে ইউরোপ আমেরিকা, এমনকি ভারতেও প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। এ-দেশের গল্প উপন্যাসে এখনও তা আসেনি। আপনার লেখায় কি আশা করা যায়?

উত্তর ঃ আমাদের সমাজ এখনও আক্রান্ত হয়নি। আর এসব বিষয়ে লিখতে আমি মন থেকে উৎসাহ পাব বলে মনে হয় না।

প্রশ্ন ঃ নারীর প্রকৃত শক্তি কি—যৌনতা, মাতৃত্ব, নাকি পরিবার গঠনের শক্তি?

উত্তর ঃ নারীর প্রকৃত শক্তি সে একজন 'মানুষ'।

টেলিভিশন ও মঞ্চ নাটক প্রসঙ্গ

কখনও টিভি নাটক লেখার কথা যিনি ভাবেননি তিনিই শেষ পর্যন্ত হলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার। আবদুল্লাহ আল মামুন যাঁর সম্পর্কে বলেন, টিভি নাটক হুমায়ূন আহমেদের কাছে ঋণী। বেশ হেলাফেলা করে টিভি নাটক লিখেন তিনি। যতটা সিরিয়াস তিনি গল্প উপন্যাসে তার সিকিভাগও টিভি নাটকে নন। অথচ তাঁর লেখা নাটকের জন্যে উম্মুখ হয়ে থাকেন অসংখ্য দর্শক। তাঁর সৃষ্ট টিভি নাটকের একটি চরিত্র নিয়েও রীতিমত তোলপাড় হয় এদেশে।

হুমায়ূন আহমেদের পরিবার এবং তাঁর মা মুগ্ধ হয়ে দেখছেন টিভি সিরিয়াল 'কোথাও কেউ নেই'

টিভি নাটক

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখা ঈদের বিশেষ নাটক 'আজ আমাদের ছুটি' দর্শকরা গ্রহণ করেননি। বেশ সমালোচনাও হয়েছে। নাটকটি সম্পর্কে আপনার কোনো প্রতিক্রিয়া?

উত্তর ঃ নাটকটির পাণ্ডুলিপি যখন পড়ে শোনাই সবাই পছন্দ করেছে। আমারও ভাল লেগেছে। কিন্তু উপযুক্ত পারফরমারদের পাওয়া গেল না। একটি টিভি নাটকের দুর্বলতার জন্যে শুধু লেখক নন ক্যামেরাম্যান, প্রযোজক, পারফরমার, কলাকুশলী, সবাই দায়ী। কারণ এটা একটা টীম ওয়ার্ক। কিন্তু আমার লেখা নাটকে সমস্ত দায়বদ্ধতা চলে আসে আমার কাঁধে।

প্রশ্ন ঃ টিভি নাটক— নাকি উপন্যাস, কোনটি লেখায় অধিক গুরুত্ব দেন?

উত্তর ঃ উপন্যাস আমি অত্যন্ত সচেতনভাবে লিখি। ভীষণ সাবধান থাকি। হেলাফেলা কম করি। নাটকের ক্ষেত্রে সবসময় এসব মানা হয় না।

প্রশ্ন ঃ টিভি ধারাবাহিক 'বহুব্রীহির'র পর মেডিক্যাল ছাত্ররা আপনার কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছে। 'কোথাও কেউ নেই' চলাকালীন মৃত্যুর হুমকি দিয়েছে অনেকে, যারা বাকেরের ফাঁসির ব্যাপারে ভীষণ ক্রেজি ছিল। এ-ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া?

উত্তর ঃ এসব একধরনের ঝোঁকের মাথায় হয়েছে। অতি আবেগের ফলাফল। এরচেয়ে বেশি কিছু ভাবি না।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখায় পুলিশ, ডাক্তার এদের প্রায়ই খুব বোকা দেখানো হয়। এটি কেন করেন?

উত্তর ঃ এটি একটা ভুল প্রশ্ন করা হল আমাকে। বোকা ডাক্তার পুলিশ কোথায় দেখলেন? বহুব্রীহিতে বোকা ডাক্তারের পাশাপাশি আরেকটি মেয়েকে দেখানো হয়েছে, যে ডাক্তারি পড়ে এবং বেশ বুদ্ধিমতী। কেবল বোকাগুলোই চোখে পড়ে বুঝি? পুলিশকেও কখনও বোকা দেখাইনি। রসিকতাপূর্ণ কোনো লেখায় হয়ত কোনো পুলিশ প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। কিন্তু পুরো পুলিশ কমিউনিটি নিয়ে রসিকতা করব কেন? প্রসঙ্গত বলি, আমার বাবা একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ বহুব্রীহিতে বোকা ডাক্তারের উপস্থিতিই ছিল বেশি। ডাক্তারি পড়ুয়া বুদ্ধিমতী মেয়ের চরিত্রটি কিন্তু দর্শকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। হয়ত এ-কারণে ডাক্তাররা তাদের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

উত্তর ঃ নাটকে ডাক্তারি পড়ুয়া বড় মেয়েটির উপস্থিতি কম হলেও সে এমন কিছু করেনি, যা থেকে মনে হতে পারে সে বোকা। আর একটি নাটকের জন্যে, নাটককে মজার করার জন্যে একটি বোকা চরিত্রকেই ব্যবহার করা হয়েছে। তার মানে এই নয় যে সমস্ত ডাক্তারই বোকা। এটা নিশ্চয়ই বুঝতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ডাক্তারি পেশা'কে গ্লোরিফাই করার মতো কিছু লিখেছেন কখনও?

উত্তর ঃ অবশ্যই লিখেছি। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা সিরিজে আমি একজন ডাক্তারের কথা বলেছি, যিনি আমার এক মামীকে অত্যন্ত জটিল এবং ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনের মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন। সেই ডাক্তার সাহেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছি আমি ঐ রচনায়। আমার একটি প্রিয় বইও উৎসর্গ করেছি তাঁকে।

প্রশ্ন ঃ টিভিতে '৯৩-এর ঈদের আনন্দমেলায় আপনার লেখা একটি 'স্কীড' দেখানো হয়েছে যেখানে শহরের রাজপথে অনেক লোকজনের সামনে একজন পুলিশ অফিসার হাতি দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। অনেক পুলিশ এতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

উত্তর ঃ ওখানে পুলিশ অফিসারের জায়গায় যে কাউকে দেখানো হলেও একই অবস্থা হত। কারণ, ওখানে কখনো হাতি আসার কথা না। আর ওটা একটা স্কীড, যেখানে রসিকতা করা হয়েছে। হাতি দেখামাত্রই যত জাঁদরেল লোক হোক না কেন ওভাবে দমে না গেলে তো রসিকতা জমবে না। একটা স্কীডকে রিয়েল লাইফ ভাবছেন কেন? স্কীডের উদ্দেশ্য হচ্ছে রসিকতা। রসিকতাকে সিরিয়াসলি নেয়ার কোনো মানে হয় না। রসিকতাপূর্ণ লেখাকে যদি সিরিয়াসলি নেয়া হয় আর সিরিয়াস লেখাগুলোকে রসিকতা ভাবা হয়, তবে তা হবে নিতান্ত হাস্যকর।

প্রশ্ন ঃ পুলিশকে গ্লোরিফাই করে কোনো লেখার কথা মনে পড়ে?

উত্তর ঃ এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না। তবে নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো লেখায় এ-প্রসঙ্গ এসেছে। আমি বলতে গর্ববোধ করি, আমার বাবা ছিলেন একজন অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান পুলিশ অফিসার।

প্রশ্ন ঃ নীলু, মিলা, কাদের বিলু প্রভৃতি নাম আপনার লেখায় বারবার ফিরে এসেছে। নামগুলো কি আপনার বিশেষ পছন্দের? কেন?

উত্তর ঃ আমি একই নাম বারবার ব্যবহার করি। 'আয়োময়' নামে আমার একটি সিরিজ নাটক আছে, আবার একটি গল্পগ্রন্থও আছে। '১৯৭১' নামে একটি ছোটগল্প আছে। একই নামে একটি উপন্যাসও আছে আমার। আমার কাছে নাম তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কি বলতে চাইছি সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ঃ আপনার সৃষ্ট মামা চরিত্রগুলো প্রায়ই উদ্ভট প্রকৃতির হয়ে থাকে। বাস্তব জীবনে আপনার মামারা কেমন?

উত্তর ঃ তাঁরা বেশ ইন্টারেস্টিং চরিত্রের।

প্রশ্ন ঃ 'এইসব দিনরাত্রি' লিখে আপনি রঙিন টেলিভিশন কিনেছিলেন। এখন আপনার বাসায় ডিশ অ্যান্টেনা। এটা কি 'কোথাও কেউ নেই'-এর সম্মানীর টাকায়

কেনা?

উত্তর ঃ না। 'এইসব দিনরাত্রি'র সময়কার আর্থিক অবস্থা আমি অনেক আগে অতিক্রম করেছি।

প্রশ্ন ঃ টিভি নাটক লেখার কথা কখন ভাবলেন? কেন ভাবলেন?

উত্তর ঃ টিভি প্রযোজক নওয়াজীশ আলী খান নাটক লেখার জন্যে অনুরোধ করেন বলেই লেখা। ১৯৮৩ সালে প্রথম টিভি নাটক লিখি। নাম 'প্রথম প্রহর'।

প্রশ্ন ঃ নওয়াজীশ আলী খান কি পূর্ব পরিচিত ছিলেন?

উত্তর ঃ না। তিনি আমার শ্বশুরবাড়িতে কি এক নাটকের ভিডিও করতে এসেছিলেন। তখন আমি উপস্থিত ছিলাম এবং পরিচয় হয়।

প্রশ্ন ঃ নিজ থেকে কোনো আগ্রহ ছিল না?

উত্তর ঃ না, কোনো তাড়া অনুভব করিনি নাটক লেখার ব্যাপারে।

প্রশ্ন ঃ কেন?

উত্তর ঃ টিভি দেখতাম না। তাই নাটকের প্রতিও কোনো মোহ তৈরি হয়নি। এখনও যে খুব টিভি দেখি তা না।

প্রশ্ন ঃ তবে কি কেবলই অনুরোধে লেখা?

উত্তর ঃ আমি নাট্যকার নই। গল্প-উপন্যাস লিখি। হঠাৎ ইচ্ছে হল এবং সেই ইচ্ছে জাগালেন নওয়াজীশ আলী খান।

প্রশ্ন ঃ টিভি টেকনিক্যাল মিডিয়া। আপনি সাহিত্যের লোক। এই টেকনিক্যাল মিডিয়াকে রপ্ত করলেন কিভাবে?

উত্তর ঃ কথাসাহিত্যের লোক হলেই কি ননটেকনিক্যাল হতে হবে? আমি দেখে দেখে শিখেছি।

প্রশ্ন ঃ একটু খুলে বলুন।

উত্তর ঃ টিভিতে আমার একটি নাটক প্রচারের পরই আমি সাধারণ ধারণা পেয়ে যাই। পরে রিহার্সেল, রেকর্ডিং ও এডিটিং-এ বসে থেকে থেকে মোটামুটি শিখেছি।

প্রশ্ন ঃ উপন্যাসের স্বাধীনতা কি টিভি নাটক লেখার ক্ষেত্রে পান?

উত্তর ঃ না, পাই না। আশাও করি না।

প্রশ্ন ঃ কেন?

উত্তর ঃ এদেশের টিভি সরকারি প্রচার মাধ্যম। এই মাধ্যমকে অনেক নীতিমালার মধ্য দিয়ে চলতে হয়।

প্রশ্ন ঃ অনেক নাট্যকার টিভি কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা এবং নানা সীমাবদ্ধতার কথা বলেন। ভাল নাটক করার ক্ষেত্রে এটাকে আপনি কঠিন বাধা মনে করেন?

উত্তর ঃ না । এতসব বাধার পরও ইচ্ছে এবং মেধা থাকলে কৌশলে অনেককিছু করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ যা চিন্তা করেন, তা কি টিভি পর্দায় স্বচ্ছন্দে নিয়ে আসতে পারছেন?

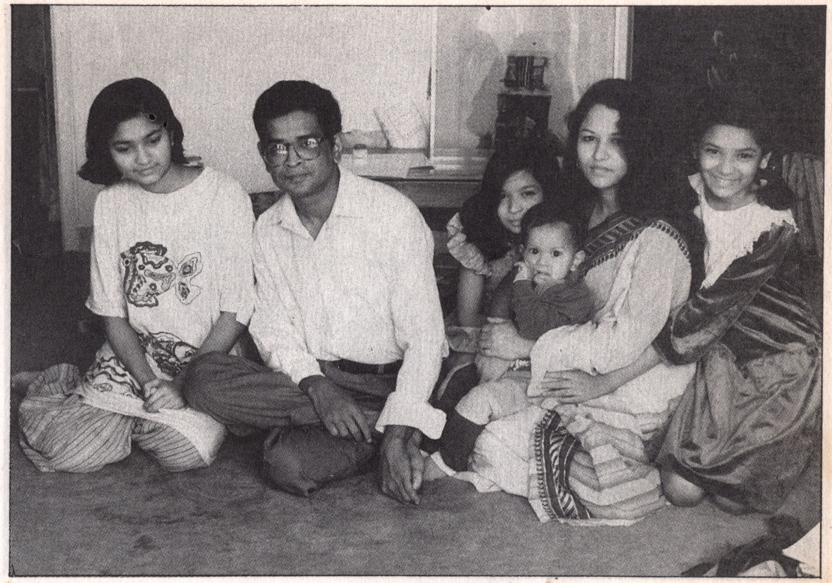

সপরিবারে হুমায়ূন আহমেদ

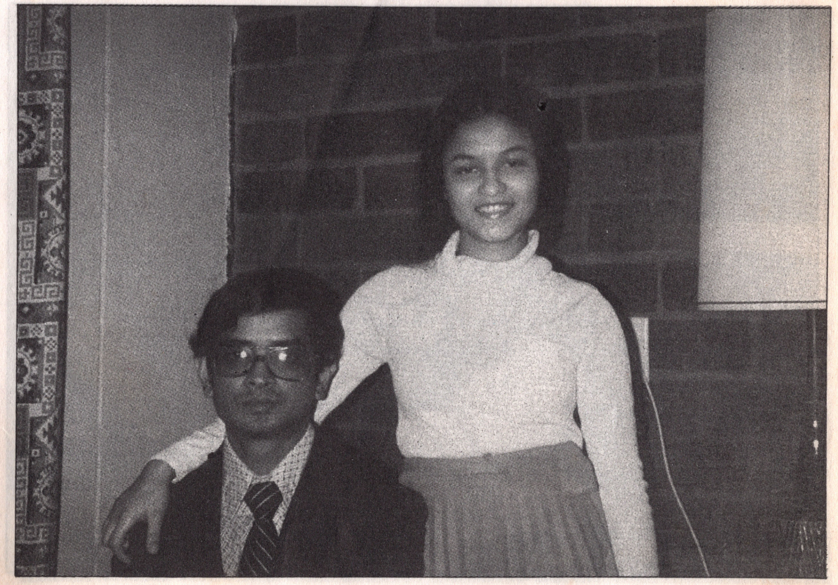

হুমায়ূন আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী

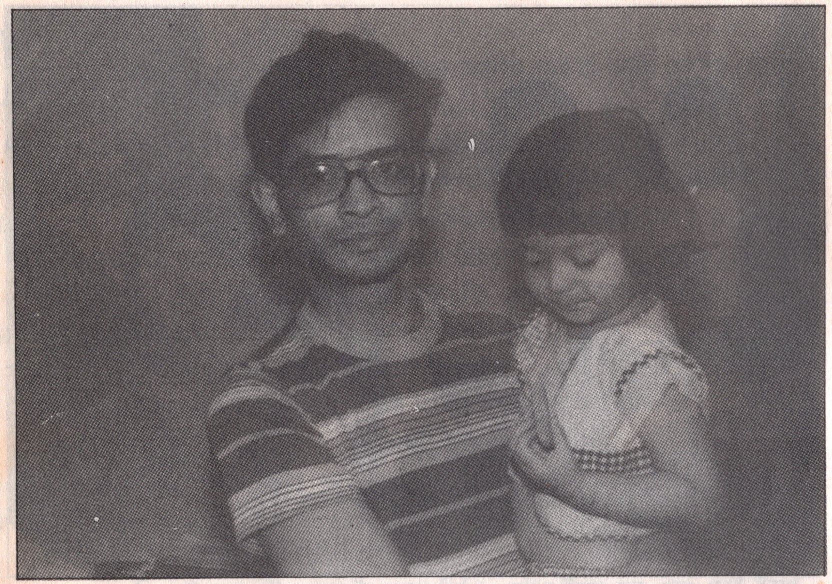

হুমায়ূন আহমেদ, কোলে বড় মেয়ে নোভা

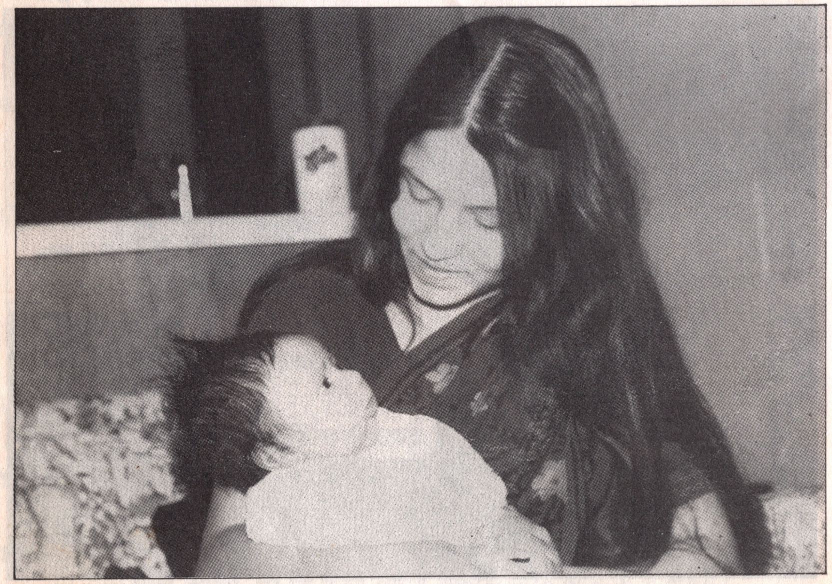

গুলতেকিন আহমেদ, কোলে তার দ্বিতীয় কন্যা শীলা আহমেদ

একমাত্র ছেলে নুহাশ গভীর আবেশে জড়িয়ে আছে বাবাকে।

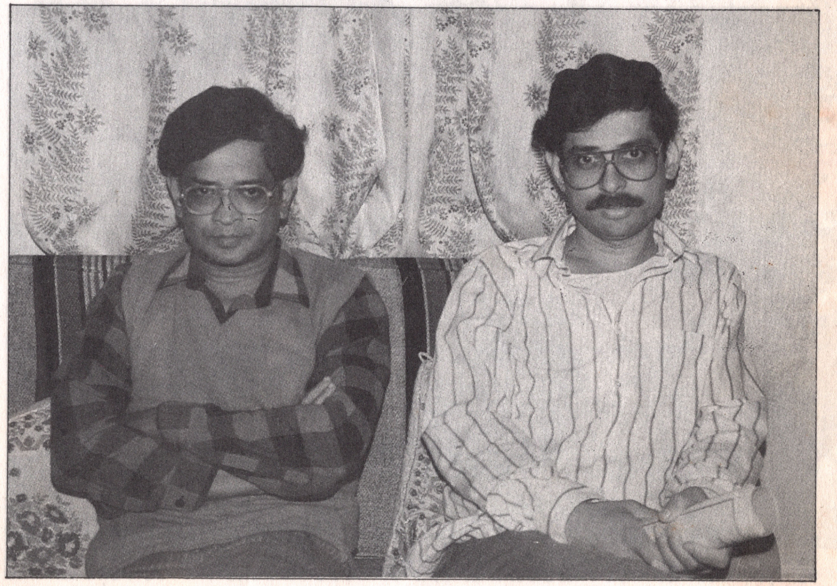

দুই লেখক ভাই ডঃ হুমায়ূন আহমেদ এবং ডঃ জাফর ইকবাল

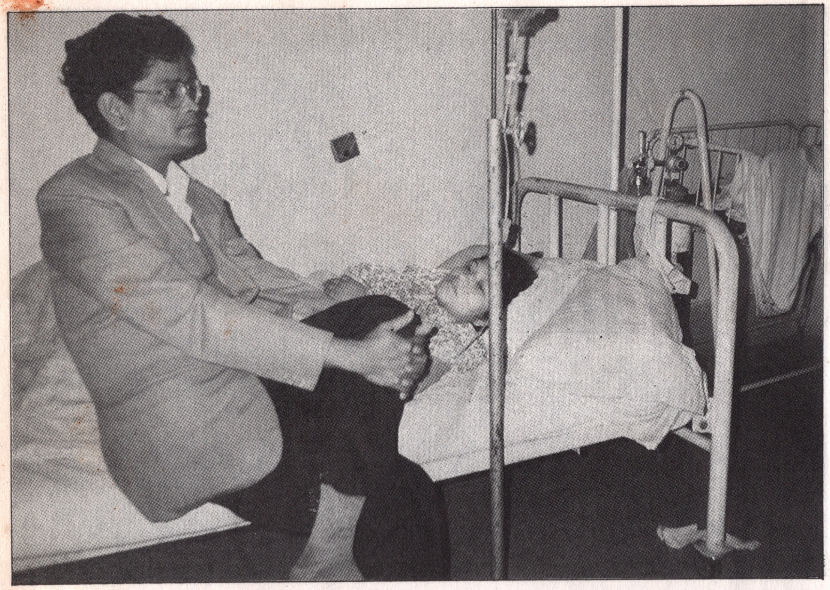

হুমায়ূন আহমেদ ও গুলতেকিন আহমেদ অপেক্ষা করছেন তাঁদের সংসারে নতুন শিশু আগমনের

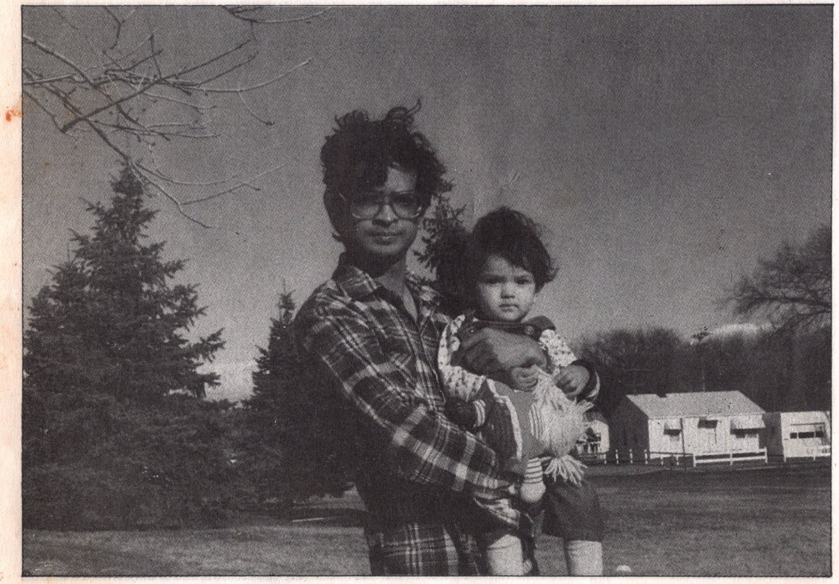

হুমায়ূন আহমেদ; কোলে মেজো মেয়ে শীলা

হূমায়ূন আহমেদের স্বপ্নেরদ্বীপ সেন্ট মার্টিনের বেলাভূমিতে তাঁর তিন কন্যা নোভা, শিলা ও বিপাশা

অচিন বৃক্ষে লেখক কন্যা নোভা। লেখক এই গাছ নিয়ে প্রথমে লেখেন ছোট গল্প অচিন বৃক্ষ, পরে লেখেন অসাধারণ এক টিভি নাটক।

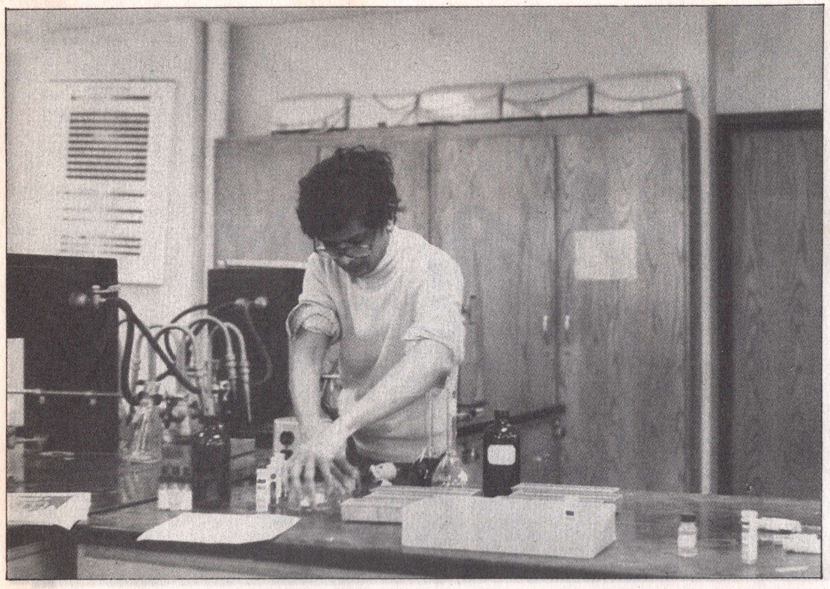

নর্থ ডেকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির ল্যাবরেটরীতে গবেষণারত হুমায়ূন আহমেদ

টিভি সিরিয়াল 'কোথাও কেউ নেই' -এর রেকর্ডিং স্টুডিওতে দৃশ্য গ্রহণের আগে

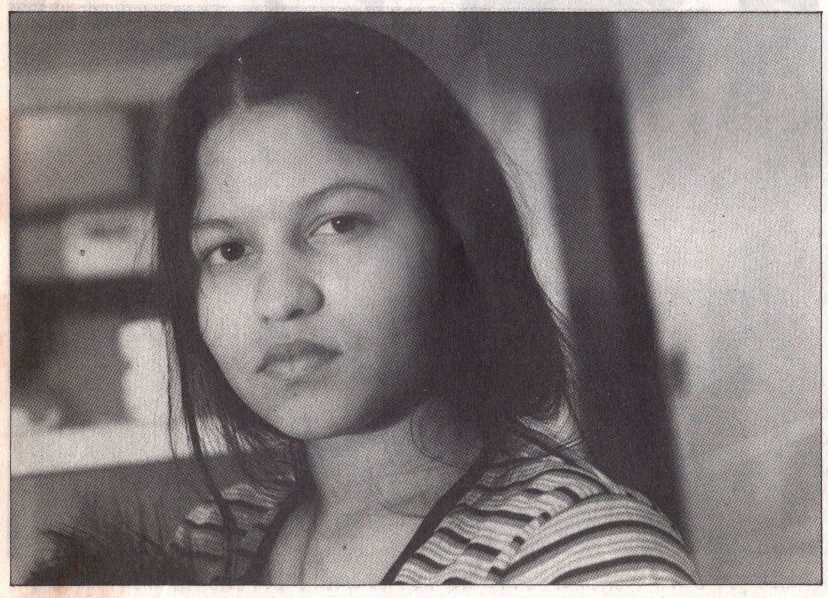

গুলতেকিন আহমেদ

মনযোগ দিয়ে দেখছেন সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা।

নিজ বাসভূমে

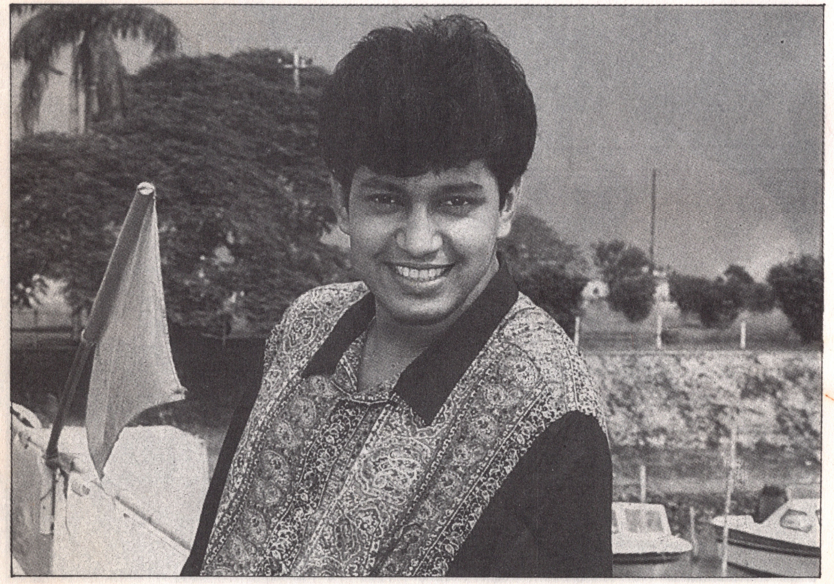

প্রশ্নকর্তা : মাহফুজ আহমেদ

উত্তর ঃ আমি নাট্যকার নই। নাটক আমার কাছে শখের ব্যাপার। নাটকে আমার বলার কিছু অপূর্ণ থাকলে উপন্যাসে বলতে পারি। বলতে না পারলে হয়ত প্রশ্ন দেখা দিত।

প্রশ্ন ঃ এটা কি মনে হয় আপনার নাটকের দর্শক যারা, তারা সবাই কিন্তু আপনার বইয়ের পাঠক নয়?

উত্তর ঃ হতে পারে। নাটক অনেক বেশি মানুষ দেখে। বইয়ের পাঠক সে তুলনায় অনেক কম।

প্রশ্ন ঃ যদি বলা হয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদকে জনপ্রিয় করার পেছনে নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদের রয়েছে অনেকখানি অবদান?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এটা সত্যি। অনেকেই টিভি নাটক দেখে আমার লেখার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বলে মনে করি।

প্রশ্ন ঃ বই, নাকি টিভি নাটক লিখে বেশি প্রতিক্রিয়া পান?

উত্তর ঃ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নাটক থেকে পাই। বইয়ের প্রতিক্রিয়া বছরের পর বছর চলতে থাকে। নাটক ফুরিয়ে যায়, বই ফুরায় না।

প্রশ্ন ঃ নিজের লেখা কোন নাটকটি আপনার সবচেয়ে খারাপ লেগেছে?

উত্তর ঃ 'আজ আমাদের ছুটি'।

প্রশ্ন ঃ অনেকের মতে 'কোথাও কেউ নেই' ধারাবাহিকের চেয়ে মূল উপন্যাস অনেক বেশি হৃদয়স্পর্শী, অনেক বেশি গোছানো।

উত্তর ঃ টেলিভিশনের সীমাবদ্ধতার কারণে উপন্যাসের সবকিছু নাটকে আনা যায় না। একটি জটিল বিষয় উপন্যাসে খুব সহজে ব্যাখ্যা করা গেলেও নাটকে তা দেখানো অসম্ভব কঠিন। উপন্যাসে 'মামুন-মুনা'র বিচ্ছেদ দেখানো হয় অন্য কারণে। মামুন-মুনার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, এটা আমি কি করে টিভি নাটকে আনব? দর্শকদের চাপেও কিছু পরিবর্তন করতে হয়। যেমন আমি কুত্তাওয়ালীর মৃত্যু দেখিয়েছি। এটা করায় দর্শকরা খুশি হলেও লেখক হিসেবে আমি কষ্ট পেয়েছি। কারণ আমি জানি এটা করা ঠিক হয়নি। আমার ভুল হয়েছে লেখা উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া। এতে আমি সৃষ্টির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এইসব দিনরাত্রি, বহুব্রীহি, অয়োময় টিভিতে প্রচারের অনেক পরে বই আকারে বেরিয়েছে। ফলে সৃষ্টির পুরো আনন্দ আমি এ নাটকগুলোয় পেয়েছি। কিন্তু 'কোথাও কেউ নেই'-এ উপন্যাসের বাইরে ইচ্ছেমত যাওয়ার সুযোগ ছিল না।

প্রশ্ন ঃ যদি বলা হয় নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদ ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদকে অতিক্রম করতে পারে নি?

উত্তর ঃ আমি তো আসলেই ঔপন্যাসিক, নাট্যকার নই। তবে একটি বিষয় 'কোথাও কেউ নেই' ধারাবাহিকে অত্যন্ত জোরালোভাবে এসেছে—যা উপন্যাসে আসেনি। মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য অনেকের কাছেই স্পষ্ট হয়নি উপন্যাসে।

ব্যাপারটি উপলব্ধি করার পর থেকেই সুযোগ খুঁজছিলাম। নাটকে আমি সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছি। অন্তত এদিক থেকে বলব নাটক উপন্যাসের চেয়ে জোরালো আবেদন রেখেছে।

প্রশ্ন ঃ অনেক দর্শক বলেছেন উপন্যাসের মুনা'র সঙ্গে নাটকের মুনার অনেক ফারাক।

উত্তর ঃ উপন্যাসের মুনা রোগা, সাদামাঠা চোহারার। কিন্তু নাটকের মুনার সৌন্দর্য অনেক বেশি। এই তো? এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না। সুবর্ণা মুস্তাফা অভিনয়ের মাধ্যমে উপন্যাসের মুনাকে ভুলিয়ে দিতে পেরেছেন বলে আমি মনে করি। বাকের চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে হয়ত দ্বিতীয় আসাদুজ্জামান নূর পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মুনা চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে সুবর্ণার বিকল্প কোনো অভিনেত্রী আমার চোখে পড়ে না।

প্রশ্ন ঃ ১৮০ জন আইনজীবী অভিযোগ করেছেন, আপনি 'কোথাও কেউ নেই' ধারাবাহিকে মতলববাজ খারাপ উকিল দেখিয়ে তাঁদের মর্যাদাহানি করেছেন?

উত্তর ঃ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলছি, এই নাটকে একজন ভাল উকিলও ছিলেন, যিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন সত্য প্রতিষ্ঠার। উকিল সাহেবরা নিজেদের সেই উকিলের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখে একজন মতলববাজ উকিলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন? এই সমাজে কি মতবলববাজ উকিল নেই? মিথ্যাকে সত্য আর সত্যকে মিথ্যা বানানোর চেষ্টা কি তাঁরা করছেন না? অবশ্যই করছেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি সবসময় নাটকের ইউনিটের সঙ্গে থাকেন। প্রায়ই ভুল-ত্রুটির কথাও বলেন। পারফরমাররা বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করেন বলে মনে হয়?

উত্তর ঃ আমি সেটে উপস্থিত আছি জানলে যাঁরা আমার নাটক করেন, তাঁরা খুশী হন বলেই তো জানি।

প্রশ্ন ঃ অধিকাংশ টিভি নাট্যকার পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েই বিদায় নেন। আপনি ইউনিটের সঙ্গে সার্বক্ষণিক থাকেন কেন? প্রয়োজক-পারফরমারদের ওপর ভরসা পান না বলে?

উত্তর ঃ আমি কাজটা ভালভাবে শিখতে চাই বলেই এই গায়েপড়া আগ্রহ। আমি একটি ছবি তৈরির পরিকল্পনা করেছি অনেক দিন থেকে। এসব হচ্ছে ছবি বানানোর প্রস্তুতি।

প্রশ্ন ঃ ছবি বানাচ্ছেন, এটাও কি অনুরোধে, নাকি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে?

উত্তর ঃ একান্ত নিজের তাগিদে ছবি করছি। এটা দীর্ঘদিনের বাসনা। এদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর আজও পূর্ণাঙ্গ কোনো ছবি হয়নি। এই ভাবনা থেকেই আসা।

প্রশ্ন ঃ নিজের লেখা ছাড়া আর কারও লেখা টিভি নাটক আগ্রহ নিয়ে দেখেন?

উত্তর ঃ নিজের নাটক যত আগ্রহ নিয়ে দেখি অন্যের লেখা দেখতে সেই আগ্রহ জাগে না। আর এখন তো বিটিভির প্রোগাম দেখাই হয় না। স্টার টিভি, জিটিভি কিংবা বিবিসিই চলে বেশির ভাগ সময়।

প্রশ্ন ঃ টিভি নাটকে কোনো পারফরমারের উপস্থিতি আগ্রহ নিয়ে দেখেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, দেখি। আসাদুজ্জামান নূর, সুবর্ণা মুস্তাফা, হুমায়ূন ফরীদি, আবুল খায়ের, আবুল হায়াত, মোজাম্মেল হোসেন, সালেহ আহমেদ প্রমুখ আমার খুব প্রিয় পারফরমার।

প্রশ্ন ঃ কখনও কোনো টিভি নাটক আপনাকে আলোড়িত করেছে? অন্তত একটি নাম বলুন।

উত্তর ঃ মামুনুর রশীদের লেখা এবং মুস্তাফিজুর রহমানের প্রযোজনায় ধারাবাহিক নাটক 'সময়-অসময়'।

প্রশ্ন ঃ আপনি তো দু'বছর পরপর টেলিভিশনে ধারাবাহিক নাটক লেখেন। 'কোথাও কেউ নেই'-এরপর আগামীতে কি বিষয় নিয়ে লেখার কথা ভাবছেন?

উত্তর ঃ এখনও কিছু ঠিক করিনি। তবে একটি ভূতের সিরিয়াল লেখার বড় ইচ্ছে। টিভির টেকনিক্যাল লিমিটেশনস্-এর জন্যে সম্ভব হয়ে উঠছে না।

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রায় নাটকে একই পারফরমারের উপস্থিতি দেখা যায় বারবার। কেন করেন?

উত্তর ঃ এটা সম্পূর্ণ প্রযোজকের দায়িত্ব। আমি শুধু এটুকু বলব - ওদের আমি ভাল করে চিনি-জানি। কে কতটা পারবে তাও আমার জানা। আর আমি কি চাই, তাও তাদের জানা হয়ে গেছে আমার সঙ্গে কাজ করতে এসে। এতে কাজ করতে খুব সুবিধা হয়। সুন্দর টীমওয়ার্ক গড়ে ওঠে। নাটকের জন্যে এটা গুরুত্বপূণ।

প্রশ্ন ঃ আপনার নাটকে অভিজ্ঞ এবং প্রধান অভিনেতার উপস্থিতি থাকে বেশি। অনেকে বলেন, প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়া আপনি কাজ করতে চান না?

উত্তর ঃ এটা ঠিক নয়। আফজাল শরীফ, দীপা ইসলাম, শারমীন রেজা ইভা, লুৎফর রহমান জর্জ— এরা তো আমার লেখা নাটকেই প্রথম অভিনয় করেছে।

প্রশ্ন ঃ মঞ্চ নাটক তেমন একটা লিখছেন না কেন?

উত্তর ঃ আমি যা বলতে চাই, তা টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রায় চারকোটি লোকের কাছে পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে মঞ্চে 'হাউসফুল' হলে সর্বোচ্চ ৫০০ দর্শক একসঙ্গে বসে নাটক দেখতে পারেন। মঞ্চের মাধ্যমে নাটকের বক্তব্য সারা দেশের দর্শকের কাছে পৌঁছাতে হলে আমাকে একটা নাটকের জন্যে দশ লাখেরও বেশি শো করতে হবে। এবং তা দেশের প্রতিটি এলাকা ঘুরে ঘুরে। এজন্যে আমাকে বাঁচতে হবে ১০ হাজার বছর। এটা অবাস্তব কল্পনামাত্র। ব্রেখটের সময় টিভি মিডিয়া আবিষ্কার হয়নি। হলে টিভির সাহায্য নিতেন। একজন লেখক নিশ্চয়ই চাইবেন কত বেশিসংখ্যক মানুষের কাছাকাছি যাওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখা টিভি ধারাবাহিক 'কোথাও কেউ নেই' প্রচারকালে সারা দেশে হুলস্থুল কান্ড ঘটে যায়। নাটকের একটি মাস্তান চরিত্র 'বাকের'-এর ফাঁসির বিরুদ্ধে সারা দেশে মিটিং মিছিল হয়েছে। দেয়ালে পোস্টার পড়েছে। আপনাকে মৃত্যুর

হুমকি দেয়া হয়েছে। [যে কারণে সিরিজের শেষ পর্ব বাসায় বসে দেখার সাহস করেন নি।} নাটক শেষ ওয়ার পরও এই প্রবণতা অব্যাহত ছিলো অনেকদিন। পুরো। ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর ঃ এমন পরিস্থিতি আমি আশা করিনি। আমার কাছে ভাল লাগেনি। আমি কি লিখব না লিখব, নাটকে বাকেরকে ফাঁসিতে ঝোলাব না মুক্ত করে দেব, তা লেখক হিসেবে আমি নির্ধারণ করব। অন্য কেউ আমাকে বলে দেবে কেন? আর একটি টিভি নাটকের চরিত্র নিয়ে এত হুলস্থুল করার তো কিছু দেখছি না। এই সমাজে অনেক সমস্যা আছে, তা নিয়ে এরকম সোচ্চার হলে অনেক সমাধান বেরিয়ে আসবে।

প্রশ্ন ঃ দর্শকের কাছ থেকে এই প্রবল চাপের মুখে নাটকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আনতেও সায় দেয়নি আপনার মন?

উত্তর ঃ কিছু পরিবর্তন তো করতেই হয়েছে। আমার মূল উপন্যাসে কুত্তাওয়ালীর মৃত্যু হয়নি, নাটকে হয়েছে। আমি এটা দেখাতে চাইনি, কারণ বাস্তবে কুত্তাওয়ালীরা মরে না। তাদের কেউ মারতে পারে না। ক্ষমতাশালীদের ছায়াতলে তারা থেকেই যায়। আমার ইচ্ছে ছিল চরিত্রটির মাধ্যমে মানুষের বিবেকের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা। এটা করতে হলে কুত্তাওয়ালীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আর মারতে হবে বাকেরকে। কিন্তু দর্শকদের চাপের কাছে আমি হার মেনেছি। কুত্তাওয়ালীকে মেরে ফেলেছি। কুত্তাওয়ালী বেঁচে থাকলে মানুষের ঘৃণা কখনও কমত না। সবসময় একধরনের চাপের মধ্যে থাকত। কিন্তু তা হল না।

প্রশ্ন ঃ বাকের'কে ফাঁসিতে ঝোলানোর পেছনে আপনার কোনো দর্শন বা উদ্দেশ্য কাজ করেছে?

উত্তর ঃ আমি মৃত্যুদণ্ডের ঘোর বিরোধী। এই শাস্তি সমস্ত পৃথিবী থেকে উঠে যাক, এটা আমি একান্তভাবে চাই। যতদিন এই শাস্তি বলবৎ থাকবে, ততদিন কখনো-না-কখনো ভুলক্রমে কোনো-একজন নির্দোষ মানুষের ফাঁসি হয়ে যেতে পারে। যে সুবিধা একজন মানুষকে সমাজ দিতে পারে না, তা কেড়ে নেয়ার অধিকার সমাজের নেই। আমরা একটি অতি ক্ষুদ্র জীবেরও প্রাণ দিতে পারি না। কোন অধিকারে প্রাণ কেড়ে নিই একজন মানুষের? একজন মুমূর্ষু রোগীরও বাঁচার প্রত্যাশা থাকে। যক্ষা, এমনকি এইডস রোগীর মাঝেও বাঁচার প্রত্যাশা কাজ করে প্রবলভাবে। কিন্তু ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত একজন মানুষের বাঁচার কোনো আশাই থাকে না। এটা যে কত মর্মান্তিক, অমানবিক—তা বলে বোঝানোর নয়।

প্রশ্ন ঃ একজন মাস্তানের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ তৈরি করে আপনি নিজস্ব দর্শন প্রচারের পথ বেছে নিলেন কেন?

উত্তর ঃ আমি একজন নিরপরাধ লোককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি। মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি। বাকের মাস্তান হয়েও কিভাবে দর্শকদের এত মমতা অর্জন করল তা তলিয়ে দেখার

দায়িত্ব সমালোচকদের। আমি শুধু বলব, যে-কোনো মৃত্যুদণ্ড কোনো সুস্থ বিবেকবান মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন না 'মৃত্যুদণ্ড' উঠিয়ে দেয়া হলে হত্যাকাণ্ড, ব্যাভিচার আরও বেড়ে যাবে?

উত্তর ঃ আমি তা মনে করি না। কারণ যারা খুনী, তারা শাস্তির কথা মনে রেখে কাউকে খুন করতে যায় না। যদি শাস্তির কথা মনেই রাখত, তা হলে এত খুন-জখম হত না।

প্রশ্ন ঃ 'কোথাও কেউ নেই' ধারাবাহিক নাটকে আপনি বাকেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছেন। যে কিনা নিরপরাধ ব্যক্তি। এর পেছনে আপনার কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কাজ করেছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। আমার মায়ের দিকের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়। ভাঁটি অঞ্চলের জমিদার বংশের মানুষ। স্থানীয় মানুষ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এঁদের বসতবাড়ি আক্রমণ করলে এঁরা আত্মরক্ষার্থে কিংবা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে এলোপাথাড়ি গুলি ছোঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ৬ জন মানুষ মারা যায়। জমিদারবাড়ির সবার বিরুদ্ধে মামলা হয়। পুলিশ আসামী হিসেবে সবাইকে বেঁধে নিয়ে আসে। আমাদের ঐ দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও ছিলেন আসামীদের একজন। তাঁর ছিল যক্ষা রোগ। স্বীকারোক্তিতে তিনি বললেন, বন্দুক নিয়ে আমি একাই বেরোই এবং গুলি করি। কিন্তু প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগই ছিল না। তিনি এমন করেছেন বাকি সবাইকে বাঁচানোর জন্যে। তাঁর যুক্তি হল আমি তো দু'দিন পরই মারা যাব। ফাঁসিতেই না হয় মরলাম। আদালতে তাঁর ফাঁসির আদেশ হল। অবশ্য আদেশ কার্যকর হওয়ার আগেই এই যক্ষা রোগী মারা যান। কিন্তু ফাঁসির আদেশ আমার ভেতরে প্রচণ্ড রেখাপাত করেছিল। আজও আমি তা ভুলতে পারিনি।

মুক্তিযুদ্ধ ও রাজাকার প্রসঙ্গ

'তুই রাজাকার' শব্দটি এ-দেশের মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হুমায়ুন আহমেদের লেখার কারণে। 'রাজাকার' শব্দটি যে কত ঘৃণার তা আর সাধারণের অজানা থাকেনি। এক সময় গঠিত হয় 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। অনেকের ধারণা ছিল 'তুই রাজাকার' এর প্রণেতা যোগ দেবেন এই দলে। কিন্তু তিনি যাননি। মুক্তিযুদ্ধ ও রাজাকার প্রসঙ্গে হুমায়ন আহমেদ নিজেকে খোলাখুলি মেলে ধরেছেন এখানে।

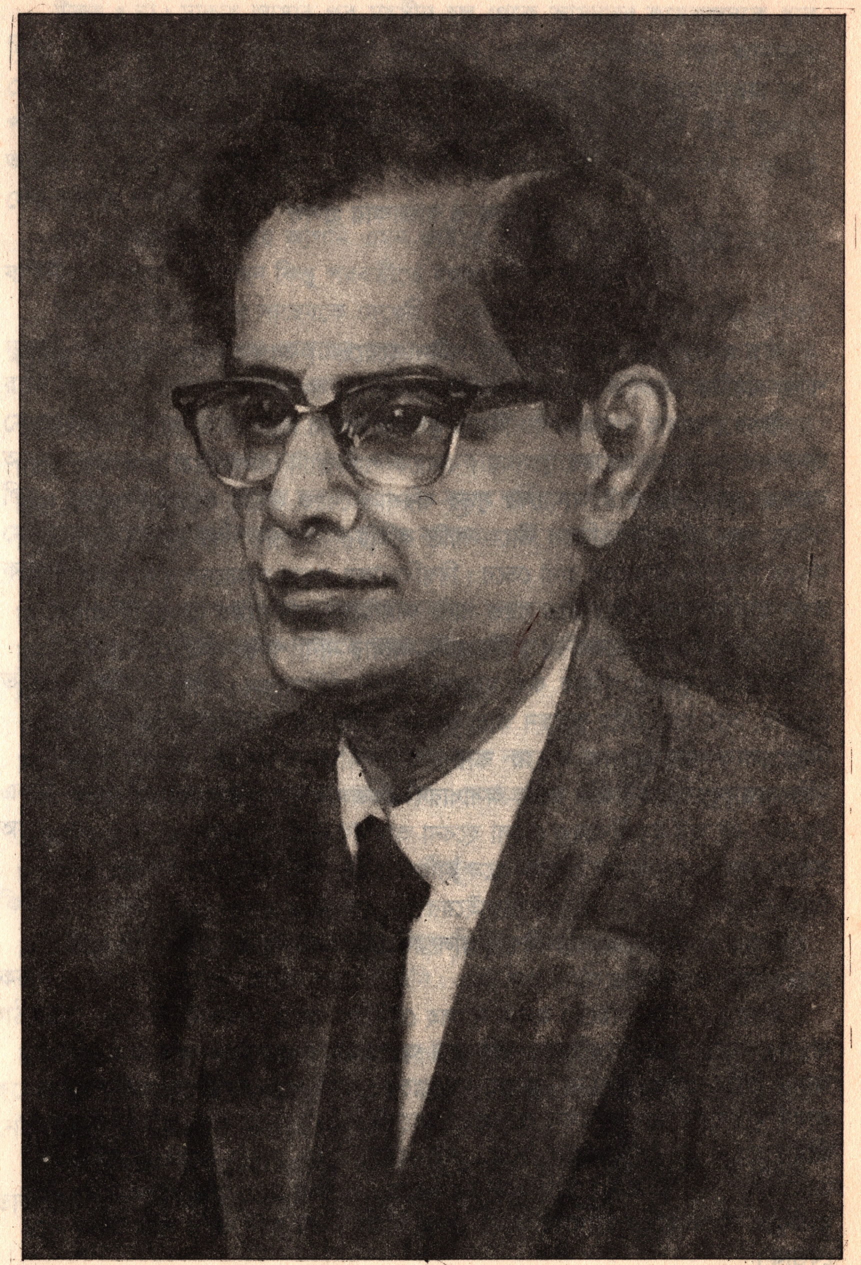

লেখকের বাবা শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ

মুক্তিযুদ্ধ ও রাজাকার প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ঃ আপনার বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আপনার নানা ছিলেন স্থানীয় শান্তি কমিটির সভাপতি। বিষয়টিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর ঃ আমার নানাজান দীর্ঘদিনের মুসলিম লীগার ছিলেন। আমাদের পারিবারিক জীবনে তখন চলছে ভয়াবহ দুঃসময়। বাবাকে পাকিস্তানি মিলিটারিরা গুলি করে হত্যা করেছে। নানা বহু কষ্টে আমাদের সুদূর বরিশাল থেকে উদ্ধার করেছেন কয়েক দফা চেষ্টার পর। তাঁর উপস্থিতিতে তাঁকে শান্তি কমিটির সভাপতি করা হয়নি। তিনি মানা করতে পারেননি আমাদের কথা ভেবে। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া আমাদের দু'ভাইয়ের জীবন তখন হুমকির মুখোমুখি। তার পরও শান্তি কমিটিতে যোগদানের ব্যাপারটি আমার মা এবং মামারা সমর্থন করেননি। আমি জানি, আমার নানা শান্তি কমিটিতে থাকার সময় মিলিটারিদের বুঝিয়ে শুনিয়ে কত মানুষের জীবন বাঁচিয়েছেন। আমি তা নিজ চোখে দেখেছি, আর যারা বেঁচে আছেন তাঁরা জানেন। অথচ নিশ্চিত মৃত্যু থেকে ফিরে আসা কিছু লোক নানাজানের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ান। তাঁকে জীবন দিতে হয় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। তাঁর মতো অসাধারণ একজন মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মারা গেলেন, এই কষ্ট ইহজীবনেও ভোলা হবেনা আমার। অথচ মিলিটারিরা নানাকে বিশ্বাস করতে পারত না। প্রায়ই বাসায় এসে হাজির হত। সার্চ করত। আমি আমার নানার পক্ষে সাফাই গাইছি না। আমার সাফাইয়ের তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন ঃ একাত্তরে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আপনার ইচ্ছে হয়নি মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে?

উত্তর ঃ ৫ নম্বর সেক্টরের জনাব সালেহ চৌধুরীর কাছে (সহকারী সম্পাদক দৈনিক বাংলা) একটি চিঠি লিখেছিলাম মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে। কেন জানি না আমার চিঠির জবাব এলো না। অবশ্য মন থেকেও আমি চাইতাম জবাব যেন না আসে। কারণ মুক্তিযুদ্ধে আমার তখন অংশগ্রহণ মানেই নিশ্চিত মৃত্যু এবং পরিবারের সবার জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি ঠেলে দেয়া। এই অবস্থা মেনে নেয়ার মতো মানসিক গঠন আমার ছিল না। আমি খুব ভীতু প্রকৃতির ছিলাম। সবকিছু ছেড়েছুড়ে জীবন বিপন্ন করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে মনের জোর পাইনি। এই গ্লানি আমি সারা জীবন বয়ে বেড়াব।

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন শেষ পর্যন্ত?

উত্তর ঃ না। ঢাকায় আসার পর মহসীন হল থেকে আমাদের কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যায়। প্রত্যেকের নামে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ, গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে, আমরা দেশদ্রোহী। জীপে করে আমাদের শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। পাশের ঘরে একজন করে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ হচ্ছে! শাস্তি চলছে। কী তীব্র চিৎকার আসছে! তারপর গোঙানির শব্দ। জানি না কি কারণে অলৌকিকভাবে বেঁচে এসেছি সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে।

প্রশ্ন ঃ মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি এমন কাউকে সরাসরি দেখেছেন, যিনি হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করেছেন কিন্তু পরবর্তীতে বহাল তবিয়তে ছিলেন?

উত্তর ঃ শর্ষিনার পীর সাহেবকে দেখেছি। একাত্তরের ভয়াবহ দিনগুলোতে আমরা দু'ভাই তাঁর কাছে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলাম। তিনি আমাদের আশ্রয় দিতে রাজি হল না। কারণ আমাদের বাবা নাকি দেশদ্রোহী। আমাদের ফিরে আসতে হল। সেখানেই জানলাম, তাঁর সাথে পাকবাহিনীর সরাসরি যোগাযোগ। অপরেশনে যাবার আগে আর্মিরা এসে তাঁর দোয়া নিয়ে যায়। এ-কারণে পীরের আস্তানা বেশ নিরাপদ ছিল। অথচ এই স্বাধীন দেশের সরকার ১৯৮০ সালে শর্ষিনার পীর মওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহকে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করেছে। এই লজ্জা, এই কষ্টের কথা আমি কাকে বলব?

প্রশ্ন ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সাধারণ ক্ষমাকে কিভাবে দেখেন?

উত্তর ঃ এটা তিনি একক দায়িত্বে করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা প্রিয়জন হারিয়েছেন, তাঁদের দিকটা ভাবেননি।

প্রশ্ন ঃ গোলাম আযমের বিচার চান?

উত্তর ঃ অবশ্যই চাই। তবে দেশকে বিভক্ত করে নয়। এ-ব্যাপারে দেশের মানুষের একটি সর্বসম্মতিসূচক প্রস্তাব পাস হওয়া উচিত। দেশপ্রেমিক প্রতিটি মানুষ শুধু গোলাম আযম নয়, রাজাকার ইস্যুর সমাধান চায়।

প্রশ্ন ঃ রাজাকারদের শাস্তির ব্যাপারে নির্মূল কমিটির 'গণ আদালত গঠন'কে কিভাবে দেখেন?

উত্তর ঃ প্রতিটি সরকার রাজাকার ইস্যুটিকে জিইয়ে রাখছে। এদের নিয়ে রাজনীতি করছে। সমস্যা সমাধানের প্রকৃত পথ খোঁজেনি। এরই ফল নির্মূল কমিটির গণ আদালত গঠন।

প্রশ্ন ঃ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধসম্পর্কিত কোনো বই বা দলিলে তাঁদের কথা লক্ষনীয়ভাবে উল্লেখ নেই। বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

উত্তর ঃ এটা আমাদের জাতীয় লজ্জা। আমাদের উচিত ছিল মুক্তিযুদ্ধে নিহত ভারতীয় সৈন্যদের সম্মানে একটি আলাদা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা। তাঁদের অবদানের

কথা অস্বীকার করা যাবে না কখনও। নিহত সৈন্যদের স্ত্রী ও সন্তানদের চোখের পানি কিছুটা হলেও লাঘব হবে যদি তাঁদের উপযুক্ত সম্মান আমরা দিতে পারি। আমি জানি, এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এ-দেশের একদল বুদ্ধিজীবী আমাকে ভারতীয় দালাল বলে অভিহিত করবেন। অথচ ভারতের প্রতি আমার কোনো মমতা নেই। কারণ ভারত আমাদের দীর্ঘসময় শোষণ করেছে। এখনও করছে। আমাদের সাহিত্যকেও ঠিকমত মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেয়নি। কাজেই এদের প্রতি কোনো মোহ থাকার কারণ নেই।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আজকের অগ্রগতির পেছনে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা অস্বীকার করবেন কি করে?

উত্তর ঃ আমি তা কখনও অস্বীকার করছি না। তবে তাদের দিন শেষ। বর্তমান ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের। বাংলা সাহিত্যে ভবিষ্যতে কোনো মহৎ সৃষ্টি এ-দেশের লেখকদের দ্বারাই কেবল সম্ভব এবং তাঁরা সেই দায়িত্ব পালন করবেন বলে আমার বিশ্বাস। বাংলা ভাষাকে এ-দেশের লেখকরাই এগিয়ে নিয়ে যাবেন। মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হওয়ার মতো উপকরণ এ-দেশে আছে। ওয়ার অ্যান্ড পীস লেখা হয়েছে নেপোলিয়ান যখন রাশিয়া আক্রমণ করলেন তার পর। এ-দেশের মানুষ ন'মাস মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। মুখের ভাষা ফিরিয়ে এনেছে। স্বৈরাচার হটিয়েছে। কাজেই মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হবে এ-দেশে, নাকি কোলকাতায়? যেখানে হিন্দু আগ্রাসনের কাছে সমস্ত মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দেয়া হয়েছে?

প্রশ্ন ঃ এ-দেশের রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ মহাত্মা গান্ধী মৃত্যুর আগে বলে গেছেন, ভগবান তুমি ভারতকে দেখো। পাকিস্তানে লিয়াকত আলি খান মৃত্যুর আগে শেষ কথা বলেছেন, আল্লাহ পাকিস্তানকে হেফাজত করো। পৃথিবীর বিখ্যাত নেতারা মৃত্যুর আগে শেষ কথাটি বলে গেছেন দেশ ও দেশের মানুষ সম্পর্কে। দেশের কল্যাণ কামনা করেই তাঁরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমাদের এক নেতা গুলি খাওয়ার পর দেহরক্ষীকে নাম ধরে বললেন, আমাকে শেষ করে ফেলেছে, আমাকে বাঁচা। মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে দেশ নয়, দেশের মানুষ নয়, তিনিই বড় হয়ে রইলেন। আমাদের দেশে সেই নেতা প্রয়োজন যিনি মৃত্যুর সময় নিজের কথা ভাববেন না, দেশের কথা ভাববেন। দেশের মানুষের কথা ভাববেন। এ-রকম নেতা তৈরি করতে হবে। এ-দেশের মানুষ একদিন সেই নেতা তৈরি করবেই। এটা আমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন ঃ এ-দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কি আপনি উদ্বিগ্ন?

উত্তর ঃ না। আমি এ-দেশের অত্যন্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ টের পাচ্ছি। এই বিশ্বাস আমার আগেও ছিল। এখন আরও তীব্রতর হয়েছে। একটি জাতির অগ্রগতির জন্যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে জাতীয় অহঙ্কারবোধ কাজ করতে হবে। এটি আছে আমাদের মধ্যে। বিজয় দিবসে এখন লক্ষ লক্ষ লোকের ঢল নামে। বাঙালি মানেই নিষ্কর্মা, এদের দিয়ে কিছু হবে না— এ-জাতীয় কমন উক্তি এখন অনেক কমে এসেছে। একসময় ধান-

চালের দাম কমানোর জন্যে আন্দোলন হত- এখন,
ধান-চালের দাম মাত্রাতিরিক্ত হারে কমে আসায় দাম বাড়ানোর জন্যে তাদের প্রতিবাদ করতে হয়। শীতকালে রাস্তায় বেরুলে আগে প্রচুর নেংটা ছেলে মেয়ে চোখে পড়ত। কাপড় পরার মত সাধ্য অনেকের ছিল না। লক্ষনণীয়-হারে এখন আর তা চোখে পড়ে না। এখন বাংলাদেশের তৈরি গার্মেন্টস সামগ্রী বিদেশে যায়। একবার আমেরিকার এক দোকানে মনকাড়া একটি কাচের জিনিস দেখে পছন্দ করেছিলাম। যত দামই হোক কিনব বলে ঠিক করলাম। কাছে গিয়ে জিনিষটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখি 'Made in Bangladesh' লেখা। গর্বে আমার বুক ফুলে গিয়েছিল। দোকানিকে বললাম, এই জিনিসটি যে-দেশের তৈরি, আমি সে-দেশের লোক। দোকানি হয়ত আমাকে পাগল-টাগল কিছু একটা ভেবেছিল। লোকসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশের জন্যে প্রকট হয়ে পড়েছিল একসময়। এখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ বিদেশে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং তারা দেশকে কিভাবে সার্ভ করছে তা বাংলাদেশের ফরেন কারেন্সির বিজার্ভ দেখেই টের পাওয়া যায়। যে-কোনো তৃতীয় বিশ্বের মাথা খারাপ হয়ে যাবে এই রিজার্ভ দেখে। আমার বিশ্বাস, জাপান আজকে যে অবস্থানে আছে, একদিন বাংলাদেশও সেই অবস্থানে গিয়ে দাঁড়াবে। জাপানের চাষের জমি আমাদের চেয়ে কম। তাদের খনিজ সম্পদ নেই, আমাদের আছে। তারা ভাত-মাছ খায়, আমরাও ভাত-মাছ খাই। তারাও খাটো, আমরাও খাটো। তারা পরিশ্রমী, আমরাও পরিশ্রমী। তারা বুদ্ধিমান, বাঙালিও বুদ্ধিমান। সুতরাং আমরা তাদের অবস্থানে কেন যাব না? অবশ্যই যাব। দেশকে নিয়ে এটা আমার ব্যক্তিগত অহংবোধ থেকে বলছি। কিন্তু একদিন এ-দেশের প্রতিটি মানুষের মাঝেই এই অহংবোধ কাজ করবে। তখন এ-দেশকে আর কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। প্রয়োজন শুধু নিজেদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে জাতীয় অহংবোধ ছড়িয়ে দেয়া প্রতিটি মানুষের মাঝে।

ব্যক্তিগত ও বিবিধ

হুমায়ূন আহমেদের বড়ো গুণ বোধহয়—স্বীকারোক্তি। স্বীকারোক্তির কারণে তাঁর ব্যক্তিগত ও বিবিধ বিষয়ে অনেকগুলো সত্যভাষণ এই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর গুণ এবং দোষ, দুর্বলতা ও শক্তি, ভাললাগা ও না-ভাললাগা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হয়েছে, একটুও বিব্রত না হয়ে তিনি তার জবাব দিয়েছেন। হুমায়ূন আহমেদের অনেকগুলো পরিচয় আছে; লেখক, নাট্যকার, সঙ্গীতপ্রেমিক, ভোজনরসিক, দাবাড়ু, শিক্ষক, সর্বোপরি বাংলাদেশের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। সমস্ত প্রান্ত থেকে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে। এই জনপ্রিয় কথাশিল্পীর অন্তর ও বাহিরের সংবাদ এই পরিচ্ছেদে।

স্কুলছাত্রী গুলতেকিনের গায়ে হলুদ

ব্যক্তিগত ও বিবিধ

প্রশ্ন ঃ পরিচিত মহলে আপনি খুব বাকপটু এবং রসিক লোক হিসেবে পরিচিত। কিন্তু পত্র-পত্রিকা বা টিভি সাক্ষাৎকারে আপনাকে খুব কাটখোট্টা, বেরসিক এবং নার্ভাস মনে হয় কেন?

উত্তর ঃ হতে পারে। আমার কিছু করার নেই।

প্রশ্ন ঃ ক্যামেরার সামনে সবসময় নার্ভাস থাকেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। ক্যামেরা দেখলেই বুকের ভেতরে কেমন করে ওঠে। আর সহজ হতে পারি না।

প্রশ্ন ঃ পত্র-পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে এত ছাড়াছাড়া রসকষহীন কথা বলেন কেন? বাস্তবে আপনি তো তেমন নন।

উত্তর ঃ ওদের প্রশ্নগুলোই থাকে রসকষহীন। নতুন এবং মজার প্রশ্ন করলেই তো আমি ভালভাবে জবাব দেব।

প্রশ্ন ঃ আপনার বড় ধরনের কোনো শারীরিক সমস্যা আছে?

উত্তর ঃ আমার জানামতে নেই।

প্রশ্ন ঃ মৃত্যুর আগে যদি শেষ ইচ্ছে প্রকাশের সুযোগ পান কি বলবেন?

উত্তর ঃ আমি মঙ্গলগ্রহে যেতে চাইব। পৃথিবীর বাইরে কোথাও যাওয়ার বড় শখ আমার।

প্রশ্ন ঃ এমন একটি অসম্ভব কল্পনা আপনার মধ্যে কাজ করছে কেন?

উত্তর ঃ তা তো জানি না। তবে এমন ভাবনা আমার কল্পনাকে উজ্জীবিত করে।

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রাত্যহিক কল্পনায় আর কিছু আছে?

উত্তর ঃ না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না। যে-সব জিনিস কল্পনা করি, তা বাস্তবে পেতেও আমি চেষ্টা করি। বেশির ভাগ কল্পনাই আমার বাস্তব রূপ পেয়েছে। আমার একটি কল্পনা ছিল সমুদ্রপাড়ে ছোট্ট একটি বাড়ি। তা আমি পেয়েছি। আমার কল্পনা ছিল পৃথিবীময় ঘুরে ঘুরে দেখা। সব দেশ না হলেও মোটামুটিভাবে পৃথিবী ঘুরে দেখেছি। বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানো আমার ভীষণ শখ। অনেক ঘুরেছি, এখনও সময় পেলেই কোথাও চলে যাই স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে। একটি ছবি বানানোর শখ

ছিল। সবকিছু ঠিকঠাক। শীঘ্রই কাজ শুরু করব।

প্রশ্ন ঃ কেমন হবে আপনার নির্মিত ছবি?

উত্তর ঃ আমার একটি গল্প আছে 'আগুনের পরশমণি'। মুক্তিযুদ্ধের ওপর কাহিনী। আমি নিজেই চিত্রনাট্য করেছি। পরিচালনাও আমার।

প্রশ্ন ঃ একজন পরিচালকের টেকনিক্যাল ধারণা কিভাবে পেলেন?

উত্তর ঃ অনেকদিন থেকেই তো টিভি নাটকের সঙ্গে জড়িত। প্রতিটি রেকর্ডিং-এ উপস্থিত থেকেছি। ঘন্টার পর ঘন্টা ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম। আর কিছু পড়াশোনা করেছি। মোটামুটি আস্থা অর্জন করেই মাঠে নেমেছি।

প্রশ্ন ঃ ভীষণ শখ ছিল কিন্তু পাননি এমন কোনো ঘটনা আছে জীবনে?

উত্তর ঃ আমার গান শেখার শখ ছিল। মাস্টারও রাখা হয়েছিল। কিন্তু মাস্টার দু'দিন পর সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন আমাকে দিয়ে গান হবে না। আমার গানের গলা নেই। খুব মন-খারাপ হয়েছিল। নিয়তিকে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

প্রশ্ন ঃ ধরুন নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেলেন। সেটা কি অবিশ্বাস্য, নাকি প্রত্যাশিত মনে হবে?

উত্তর ঃ এ-পৃথিবীতে কোনোকিছুই অবিশ্বাস্য নয়। তবে এটা আমার জন্যে প্রত্যাশিতও নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি সবসময় টিভি নাটকের ইউনিটের সঙ্গে থাকেন। অনেক সময় পারফরমারদেরও সাজেশন দেন। অনেক পারফরমার বলেছেন আপনি অভিনয়ও ভাল বোঝেন। অভিনয় করতে বলা হলে আপনার সৃষ্ট কোন চরিত্রটি বেছে নেবেন?

উত্তর ঃ অভিনয় নিয়ে কখনও চিন্তা করিনি। ধরে রেখেছি কখনও অভিনয় করব না। কাজেই ওটা নিয়ে চিন্তারও অবকাশ নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনি অভিনয় ভাল বোঝেন বলে অনেক খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রী মন্তব্য করেছেন।

উত্তর ঃ আমি কেন, অভিনয় যে-কেউ বুঝবে। অভিনয় তো একধরনের অনুকরণ। সেই অনুকরণ কতটা বাস্তব হচ্ছে সেটা ধরতে পারা তো আমার উচিত।

প্রশ্ন ঃ গান শেখার ব্যাপারে আপনার যে প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল তার সিকি ভাগও কি অভিনয় সম্পর্কে ছিল না?

উত্তর ঃ না। একেবারেই ছিল না, অভিনয়কে সবসময় আমার কাছে একটি নিম্নশ্রেণীর শিল্পমাধ্যম মনে হয়েছে। এটি হচ্ছে পরাশ্রয়ী। অন্যকে আশ্রয় করে এই শিল্পকে বড় হতে হয়। অভিনয় করতে হলে একটি পাণ্ডুলিপি প্রয়োজন। লেখকের প্রয়োজন। এটা একটি পরাশ্রয়ী বিদ্যা। পরাশ্রয়ী বিদ্যার প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনার নিত্য ব্যস্ততার মাঝে এমন কিছু কি এখনও অপ্রকাশিত রয়ে গেছে, যে কারণে প্রতিনিয়ত অন্তর্তাগিদ অনুভব করেন?

উত্তর ঃ মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি বড় লেখার ইচ্ছে আমার দীর্ঘদিনের। অনেকবার পরিকল্পনা সাজিয়েছি। কিন্তু একটি লাইনও লিখতে পারিনি।

প্রশ্ন ঃ আর কোনো তাগিদ?

উত্তর ঃ এটাই প্রধান অন্তর্তাগিদ। এটা নিয়েই দিনরাত ভাবছি।

প্রশ্ন ঃ অনেক আগ থেকে পাঠকরা জানে আপনার এই তাগিদের কথা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটিও নিয়েছিলেন অনেকদিনের। লেখা কি মাথায় আসছেই না?

উত্তর ঃ আসলে এমন একটি লেখার জন্যে যে পরিমাণ সময় এবং ডিভোশন দেয়া প্রয়োজন তা দিতে পারছি না। নানানরকম ব্যস্ততা। অন্যান্য লেখালেখি, টিভি নাটক— সব বিষয়ে এমনভাবে জড়িয়ে আছি, সেভাবে সময় হয়েই উঠছে না।

প্রশ্ন ঃ নিজেকে সুভাষী লোক মনে করেন?

উত্তর ঃ না। তবে অন্তরঙ্গ পরিবেশে সুভাষী। কিন্তু এর বাইরে কাটখোট্টা টাইপের।

প্রশ্ন ঃ সমালোচনায় কাতর হন? বিচলিত হন নাকি ভয় পান?

উত্তর ঃ কাতরও হই না, বিচলিতও না। ভয়ও পাই না। লেখালেখির এই একুশ বছরে এগুলো এত বেশি শুনেছি যে এখন আর গায়ে লাগে না। যা ইচ্ছে তাই বলুক, কিছু যায় আসে না। আগে আমার বিরুদ্ধে কিছু লেখা হলে খুঁজে বের করে পড়তাম। অনেক সময় লোক পাঠিয়েও সংগ্রহ করতাম। পেপার কাটিংও রাখতাম। এখন কেউ যদি এসে বলে অমুক পত্রিকা কিংবা অমুক লেখক আপনাকে ধুয়ে ফেলেছে। শুনে আমি হাসি। পত্রিকাটি পড়ার কিংবা লোকটি সম্পর্কে জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করি না। যদি কোনো পত্রিকায় আমাকে নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে কিছু লেখা হয়, তাও এনে পড়ার ইচ্ছে হয় না। আমার কাছে মনে হয় আমি কি করছি না করছি আমি জানি। আমি যাচ্ছি, কি লিখছি আমি তা ভাল করে জানি। কে কি ভাবল, কে কি বলল এটা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখার প্রশংসা করেন অসংখ্য পাঠক। 'প্রশংসা'কে আপনি কিভাবে গ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ যে কোনো মানুষই প্রশংসা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। আমি তো মানুষ। রোবট না। কাজেই প্রশংসা আমার অবশ্যই ভাল লাগে। আমি যদি বলি, না প্রশংসা আমাকে মোটেই কাবু করে না— সেটা মিথ্যে বলা হবে। মিথ্যে বলার আমি কোনো প্রয়োজন দেখি না।

প্রশ্ন ঃ আপনি বিরল ভাগ্যবান লেখকদের একজন যিনি দুই যুগ ধরে পাঠক-পাঠিকাদের মোহাবিষ্ট করে রেখেছেন। এজন্যে আপনার বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া?

উত্তর ঃ সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌তায়ালার।

[একটু থেমেই হুমায়ূন আহমেদ বললেন, তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা ধরেই নেবেন আমি জামায়াতের লোক। কথাটি বলেই হেসে উঠলেন। পাশে ছিলেন তখন 'কোথাও কেউ নেই'-এর দারোয়ান চরিত্রে রূপদানকারী সালেহ আহমেদ। যিনি

হুমায়ূন আহমেদের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনিও হেসে ওঠেন এবং একই মত দেন।]

প্রশ্ন ঃ গ্যাব্রিয়েল মার্কুয়েজের লেখায় মজার মজার অনেক চরিত্র থাকে। তাঁর লেখা 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস অব সলিটিউড'-এ আর্কাডিও নামে একটি চরিত্র বিজ্ঞানের নামে, আবিষ্কারের নামে জিপসিদের কাছ থেকে এটা- সেটা কিনে বারবার ঠকছে। এই উদ্ভট সব নেশার জন্যে স্ত্রী উরসুলার যন্ত্রণার শেষ নেই। আর বাচ্চাদের মজা কে দেখে! আপনিই বলুন, লেখক মার্কুয়েজের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র আর্কাডিউর যদি সামান্য মিলও থাকে আর হিমু কিংবা টিভি ধারাবাহিক বহুব্রীহির বাবা বা মামার সঙ্গে যদি আপনার সামান্যতম মিল থাকে, তা হলে কেমন হয়, একবার ভেবে দেখুন না।

উত্তর ঃ এই প্রশ্নের জবাব আমার স্ত্রী এবং সন্তানরা ভাল জানে। আমি জানি না। তবে মিল থাকলে মনে হয় পরিবারের সবাই আমার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করত। তেমন সমস্যা হত বলে মনে হয় না। সব পরিবারে কিছু-না-কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ থাকেন, তাতে খুব একটা সমস্যা হয় কি?

[মিসেস হুমায়ূন বললেন, ওর সৃষ্ট অনেক চরিত্রের সঙ্গেই ওর প্রচুর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কখনও মনে হয় ও নিজেই তো মিসির আলি, হিমু, কিংবা বহুব্রীহির মামা। দীর্ঘদিনের জানাশোনা এবং বোঝাপড়ায় এসব কোনো সমস্যা তৈরি করতে পারে না। কারণ, সব মিলিয়ে ও এক দারুণ মানুষ। তিন কন্যা বিপাশা, শিলা ও নোভা বলল, আব্বুকে সবসময় ভাল্লাগে, একমাত্র রাগের সময় ছাড়া। রেগে গেলে যখন চোখ বড় বড় করে কথা বলে তখন খুব খারাপ লাগে।]

প্রশ্ন ঃ আপনি নিজে আপনার সৃষ্ট কোনো চরিত্রের সঙ্গে মিল খুঁজে পান?

উত্তর ঃ মিসির আলিতে কিছুটা ছায়া খুঁজে পাই। আমি যুক্তি ভালবাসি। মিসির আলিও বাসেন। আমি হৈ-চৈ করতে পছন্দ করি, বহুব্রীহির মামাও তা করেন। উদ্ভট ব্যাপারে আমার খুব আগ্রহ। হিমুর বেলাতেও তাই।

প্রশ্ন ঃ আপনার কিছু কিছু চরিত্র অত্যন্ত স্পর্শকাতর। লিখতে লিখতে আপনি কাঁদেন' আবার পড়তে পড়তে ও অনেকেই চোখের পানি ফেলেন। আপনি নিজেও কি খুব স্পর্শকাতর?

উত্তর ঃ কিছুটা স্পর্শকাতর তো বটেই।

প্রশ্ন ঃ আলবার্ট কামুর উপন্যাস 'দ্যা ফল'-এর নায়ক সেই ব্যারিস্টারের মতো জেব্রা ক্রসিং-এ গাড়ি স্টার্ট নিতে দেরি করায় পেছন থেকে কেউ যদি আপনাকে জঘন্য গালি দিয়ে বসে, আপনি কি করবেন?

উত্তর ঃ আমি কিছুই করব না। তবে আহত হব। কষ্ট পাব। আমার সুখী হবার ক্ষমতা যেমন অসাধারণ, দুঃখ পাবার ক্ষমতাও ঠিক তেমন। তাই বলে অতি স্পর্শকাতর কোনো চরিত্রের মত কিছু করব না। আমার মধ্যে যুক্তি ব্যাপারটি আছে। প্রবলভাবেই আছে, যুক্তি অতি স্পর্শকাতর হতে বাধা দেয়।

প্রশ্ন ঃ ধরুন, পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। একমাত্র আপনি বেঁচে আছেন।

আল্লাহর কাছে কি চাইবেন—একটি কলম, সুন্দরী নারী, নাকি অন্য কিছু?

উত্তর ঃ আমি গোটা পৃথিবী ফেরত চাইব।

প্রশ্ন ঃ প্রত্যেকেরই দ্বৈতসত্তা থাকে। এটাই স্বাভাবিক। হুমায়ূন আহমেদের ভেতর কি আরেকজন হুমায়ূন আহমেদ আছেন, যিনি খুন করেন, কামনা করেন, বনবাসে যান— যাঁর কথা আপনার মনে থাকে না। মনে রাখেনও না।

উত্তর ঃ থাকতে পারে। আমি জানি না। জানতে ইচ্ছেও হয় না। যে হুমায়ূন আহমেদকে আমি জানি সে খুব খারাপ মানুষ না, এটুকু বলতে পারি।

প্রশ্ন ঃ এই জীবনে কোন কাজটির জন্যে নিজেকে ঘৃণা করেন?

উত্তর ঃ ১৯৭১-এ প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে নিজের জীবন বাঁচাতে তৎপর ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ কখনও নিখোঁজ হতে ইচ্ছে করে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, করে। প্রচণ্ড ইচ্ছে করে।

প্রশ্ন ঃ হয়েছেন কখনও?

উত্তর ঃ ছোটবেলায় কয়েকবার চেষ্টা করেছিলাম। প্রতিবারই আমাকে ধরে আনা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ নিখোঁজ হওয়ার জন্যে উপযুক্ত হিসেবে কেমন জায়গা বেছে নিতে চাইবেন?

উত্তর ঃ কোনো নির্জন দ্বীপ।

প্রশ্ন ঃ নির্জন দ্বীপ কেন?

উত্তর ঃ একাকী থাকার আনন্দ ও বেদনা খুঁজব।

প্রশ্ন ঃ খ্যাতি, বিত্ত, ভালবাসা সবই পেয়েছেন ঈর্ষণীয় হারে। এখন আপনি কিসের অভাব বোধ করছেন?

উত্তর ঃ সময়ের। মনে হয় সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। কিছুই যেন করতে পারলাম না। খুব কষ্ট হয়। চোখে পানি এসে যায়।

প্রশ্ন ঃ কখনও নিজেকে অসুখী মনে হয়?

উত্তর ঃ না। বানানো দুঃখ হয়ত অনেক মানুষের আছে। আমার কোনো বানানো দুঃখ নেই।

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর কি মনে হয়?

উত্তর ঃ জ্যোৎস্না রাত, বৃষ্টি, নারী এবং শিশু।

প্রশ্ন ঃ সবচেয়ে কুৎসিত?

উত্তর ঃ মাকড়সা।

প্রশ্ন ঃ এতকিছু থাকতে মাকড়সা কেন?

উত্তর ঃ দেখলেই ভীষণ ভয় লাগে। ঘৃণা হয়। গা যেন কেমন করে ওঠে।

প্রশ্ন ঃ নিজ চরিত্রের কি কি বৈশিষ্ট্য পছন্দ করেন না?

উত্তর ঃ হঠাৎ রেগে যাওয়া, অসম্ভব রেগে যাওয়া। আর একটি বদ অভ্যাস আছে, মাঝেমধ্যে মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা, যা হয়ত কখনোই তার প্রাপ্য নয়। কোনো কারণে মাথা গরম হয়ে আছে, কিছু ভাল লাগছে না, এমন কোনো মুহূর্তে এ-জাতীয় দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু যখন বুঝতে পারি কাজটি ঠিক হয়নি, তখন তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ভুগি। দুঃখ প্রকাশ না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাই না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কখন, কিসে বিরক্ত হন?

উত্তর ঃ লেখার টেবিলে বসে আছি। সবকিছু গুছিয়ে এনেছি। চরিত্রগুলো মাথার ভেতর একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে। ঠিক এ-মুহূর্তে বাসায় কেউ এল। কিছুতেই তাকে বিদায় করতে পারছি না। একইসঙ্গে লোকটির সঙ্গে কথা বলছি—এদিকে মাথার ভেতর চরিত্রগুলো অনবরত কথা বলে যাচ্ছে। এ-দুটো মিলিয়ে ভয়ানক অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যাই।

প্রশ্ন ঃ উপন্যাস, গল্প—নাকি টিভি নাটক, কোনটা লিখতে সহজ বোধ করেন?

উত্তর ঃ টিভি নাটক।

প্রশ্ন ঃ সবচেয়ে কম সময়ে কোন নাটক লিখেছেন?

উত্তর ঃ একটির কথা বলা যাবে না। প্রায় সব নাটকই একই সময় নিয়ে লেখা। সকালে বসলে বিকেলের মধ্যে একটি এক ঘণ্টার নাটক শেষ হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ উপন্যাসের বেলায় কেমন সময় নেন?

উত্তর ঃ উপন্যাসের ব্যাপ্তি অনেক। এজন্যে সময়ের প্রয়োজন বেশি। তবে 'নন্দিত নরকে' এবং 'নির্বাসন' একরাতে লিখে শেষ করেছি।

প্রশ্ন ঃ একটানা লিখে শেষ করার ক্ষেত্রে কোনো সুবিধা আছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। একই মুডে শেষ করা যায়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুড থাকে। ক'দিন পরপর বসলে এই মুড পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন ঃ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একজন লেখকের মেধা কি কমতে থাকে? মাথা কি খালি হয়ে যায়?

উত্তর ঃ শরীরের অন্যান্য পেশির বেলায় এটি সত্য। বয়স যত বাড়তে থাকে পেশিগুলোর শক্তি ততই কমতে থাকে। কিন্তু মস্তিষ্কের পেশির বেলায় এটি সত্য নয়। যদি সত্য হত, তা হলে রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে এত চমৎকার সব রচনা লিখতে পারতেন না। পিকাসো তো ভাল ভাল ছবিগুলো এঁকেছেন শেষ বয়সে।

প্রশ্ন ঃ খেলাধুলায় আপনার আগ্রহ কেমন?

উত্তর ঃ মাঠে গিয়ে দেখি না। তাই বলে আগ্রহ নেই, এটা ভাবা ঠিক না। খেলা নিয়ে আমার অনেক আগ্রহ।

প্রশ্ন ঃ কোন খেলা আপনি আগ্রহ নিয়ে দেখেন?

উত্তর ঃ ফুটবল। বিশেষ করে বিশ্বকাপ ফুটবল।

প্রশ্ন ঃ '৯০-এর বিশ্বকাপে কাকে সাপোর্ট করেছিলেন?

উত্তর ঃ ক্যামেরুন'কে।

প্রশ্ন ঃ কেন?

উত্তর ঃ ওরা কালো তো। আমাদের মতো কিছুটা। আর সাদা চামড়ার বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ তো আছেই। খুব মজা পেয়েছি ক্যামেরুনের খেলা দেখে।

প্রশ্ন ঃ কোন খেলোয়াড়ের খেলা বেশি ভাল লেগেছে?

উত্তর ঃ ক্যামেরুনের সেই বিখ্যাত খেলোয়াড়, যে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু'দুটি গোল করলো। কি যেন নাম..........রজার মিলা [অনেকক্ষণ কপাল চুলকিয়ে কিছু-একটা আবিষ্কার করার মতো ভঙ্গিতে]।

প্রশ্ন ঃ ক্রিকেট পছন্দ করেন?

উত্তর ঃ না। একেবারে না। আমার কাছে বোরিং মনে হয়। ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন এটা কিভাবে সম্ভব বুঝি না। হয়ত বুঝি না বলেই এমন লাগে।

প্রশ্ন ঃ দাবায় আপনার প্রচণ্ড আগ্রহের কথা জানি।

উত্তর ঃ দাবা খেলায় বুদ্ধির খুব প্রয়োজন। নিখুঁত বুদ্ধিমান না হলে দাবায় জেতা যায় না। যখন কেউ একজন দাবা খেলায় হেরে যায়, তখন ধরে নিতে হবে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে বুদ্ধিতে খাটো। এটা মেনে নেয়া খুব কষ্টের। একটি বাচ্চা ছেলে ৪০ বছরের একজনকে হারিয়ে দিতে পারে এই বুদ্ধির খেলায়। পেশির পরাজয় আমরা গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু মস্তিষ্কের পরাজয় মেনে নেয়া প্রচণ্ড কষ্টের।

প্রশ্ন ঃ আপনি তো বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সদস্য। উল্লেখযোগ্য কোনো দাবাড়ুর মুখোমুখি হয়েছেন কখনও?

উত্তর ঃ হয়েছি, বাংলাদেশের নিয়াজ মোরশেদ এবং রাশিয়ার লুভিকভের।

প্রশ্ন ঃ কখনও জয়ী হয়েছেন?

উত্তর ঃ মাথা খারাপ! চরম হার হেরেছি নিয়াজের কাছে।

প্রশ্ন ঃ ছোটবেলা থেকেই দাবা খেলছেন। উল্লেখ করার মতো কোনো জয় নেই?

উত্তর ঃ এই ভাইবোন বা কোনো নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে হয়ত জিতেছি। এর বাইরে সবই আমার অনুল্লেখ্য পরাজয়।

প্রশ্ন ঃ ভিডিওতে ছবি দেখেন?

উত্তর ঃ সময় পেলেই দেখি।

প্রশ্ন ঃ ভিডিওতে দেখা কোনো প্রিয় ছবি?

উত্তর ঃ রোমান হলিডে, একদিন প্রতিদিন, পথের পাঁচালী, আরও অনেক........।

প্রশ্ন ঃ এখনকার হিন্দি ছবি দেখেন?

উত্তর ঃ না। হিন্দি আমি বুঝি না। দেখিও না।

প্রশ্ন ঃ ভারতের কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রী আপনাকে আলোড়িত করেছে?

উত্তর ঃ শাবানা আজমীর 'খন্ডহার' দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি।

প্রশ্ন ঃ ইংরেজি ছবিতে কারা আপনার প্রিয়?

উত্তর ঃ ডাস্টিন হফম্যান। এছাড়া লরেন্স অলিভিয়ার, অড্রে হেপবার্ন, পিটার ব্রুক, এলিজাবেথ টেলর খুব প্রিয়।

প্রশ্ন ঃ মনে আছে কি স্ত্রীর সাথে প্রথম কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল?

উত্তর ঃ মনে নেই। অনেক আগের কথা। তবে এটা নিশ্চিত বলতে পারি ঝগড়ার কারণ আমার কোনো উদ্ভট আচরণ বা অকস্মাৎ মাথা-গরম করা।

প্রশ্ন ঃ স্ত্রীর সঙ্গে সর্বোচ্চ কত সময় কথা না বলে থেকেছেন?

উত্তর ঃ বড়জোর দু'-চার মিনিট। কথা না বলে আমি থাকতে পারি না। মনে হয় দম বন্ধ হয়ে যাবে। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় কথা না বলে থাকা আমার জন্যে কঠিন শাস্তির সমান।

প্রশ্ন ঃ ঝগড়া বা রাগ-অভিমান ভাঙানোর ব্যাপারে কার ভূমিকা অগ্রণী?

উত্তর ঃ প্রতিবারই আমার। প্রথমত আমার কারণেই পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। দ্বিতীয়ত কথা না বললে নিজের কাছে বড় অস্বস্তি লাগে।

প্রশ্ন ঃ গান শোনেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ভীষণ। রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব প্রিয়।

প্রশ্ন ঃ কার কণ্ঠে?

উত্তর ঃ আমার কাছে সুর এবং বাণীই মুখ্য। কে গাইল সেটা পরের ব্যাপার।

প্রশ্ন ঃ অন্য কোনো গান?

উত্তর ঃ ধীরলয়ের ইংরেজি গান, বিশেষ করে কান্ট্রি মিউজিক, লোকগীতি এবং পুরানোদিনের হিন্দি গান ভাল লাগে।

প্রশ্ন ঃ এখনকার ছেলেমেয়েদের কাছে ব্যান্ড সঙ্গীত খুব প্রিয়। শুনেছেন কখনও?

উত্তর ঃ আমার মেয়েরা যেহেতু শোনে, আমার কানেও আসে। আমার খারাপ লাগে না। এটা শুনব, ওটা শুনব না—এরকম কোনো শুচিবাই আমার নেই।

প্রশ্ন ঃ মাইকেল জ্যাকসন এবং ম্যাডোনাও হালের তরুণ-তরুণীদের খুব প্রিয়। এদের সম্পর্কে কিছু জানেন?

উত্তর ঃ ভিডিওতে দু'-একবার দেখেছি, তাও মেয়েদের কল্যাণে। আমার কাছে শারীরিক গান মনে হয়েছে। কণ্ঠের চেয়ে শরীরের কাজই বেশি। এটা ভিডিও'তে দেখেছি বলে কি না জানি না।

প্রশ্ন ঃ একাকী কোনো এক রাতে রিকশায় চেপে ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াতে মন চাইলে বেরিয়ে পড়বেন?

উত্তর ঃ না, এমন দুঃসাহস নেই।

প্রশ্ন ঃ একটি কথা প্রচলিত আছে যে, কোনো পাঠক যদি আপনার লেখা ৬০টির অধিক বই পড়েন, তবে ঐ পাঠক এতই সম্মোহিত হয়ে যান যে, আপনারই সৃষ্ট কোনো উদ্ভট চরিত্রের মতো আচরণ শুরু করেন। এরকম কত পাঠকের সন্ধান পেয়েছেন আপনি?

উত্তর ঃ অনেকের কথা শুনেছি। ওদের সম্পর্কে কিছু বলার নেই। কারণ এটা সাময়িক। ঝোঁকের মাথায় এমন করছে। ঝোঁক কেটে গেলে স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

প্রশ্ন ঃ খুব রেগে গেলে কি করেন? আপনি তো প্রায়ই রাগেন।

উত্তর ঃ খুব চেঁচামেচি করি। নিজেকে সামলাতে পারি না। তবে অকারণে কখনও রাগি না।

প্রশ্ন ঃ আমেরিকায় আপনার লোভনীয় অফার ছিল বলে শুনেছি। গ্রহণ না করে দেশে ফিরে এলেন কেন?

উত্তর ঃ আমার ভাল লাগছিল না। কেবলই দেশের কথা মনে পড়ছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনি কখনও কখনও নিজেকে অহংকারী বলেন। কিন্তু আপনার ঘনিষ্ঠজনদের মতে মোটেই তা নন।

উত্তর ঃ আচ্ছা, এবার বললাম আমি অহংকারী নই। আগে যেটা বলেছি তা ভুল। আসলে আমি নিজেকে কখনোই অহংকারী ভাবিনা। কেউ কেউ জানি না কেন আমাকে অহংকারী বলতে শুরু করলেন। আর আমি ওদের কিছু না বলে চুপচাপ থেকেছি। এতেই চালু হয়ে গেছে আমি অহংকারী। আসলে আমি তা না।

প্রশ্ন ঃ আপনার সম্পর্কে একটি প্রচলিত কথা আছে, কোনো বন্ধুত্বই নাকি আপনার এক বছরের বেশি টেকে না?

উত্তর ঃ মনে হয় কেউ আমাকে বেশি দিন সহ্য করতে পারে না। সমস্যাটি নিশ্চয়ই আমার সৃষ্ট। তবে ইদানীং দু'-চারজনের সঙ্গে বেশ ক'বছর হল ভাল সম্পর্কই তো যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে সহ্য করতে না পারার কোনো কারণ আছে?

উত্তর ঃ তা তো জানি না, আমার একসময়ের ঘনিষ্ঠজনদের জিজ্ঞাসা করলে হয়ত জানা যাবে।

প্রশ্ন ঃ ভক্ত পাঠকদের কেউ কি আপনার কাছে কোনো সাহায্যের জন্যে ছুটে আসেন?

উত্তর ঃ আসেন। বেশির ভাগ সময়ই মানসিক সমস্যা নিয়ে আসেন। আমি তাঁদের কোনো সাহায্য করতে পারি না।

প্রশ্ন ঃ মেধা, লেখালেখি, সৌন্দর্য, বিত্ত কিংবা অন্য যে-কোনো ক্ষেত্রে কাউকে ঈর্ষা করেন?

উত্তর ঃ ঈর্ষা একটি মানবিক ব্যাপার। এটা থাকবেই। তবে সৌন্দর্য এবং বিত্তের দিক থেকে ওমুক আমার চেয়ে অনেক ওপরে এমনটি ভাবার মতো বোকা আমি নই। তবে মেধা এবং লেখালেখি নিয়ে অবশ্যই ঈর্ষার ব্যাপার আছে। আমার চারপাশে প্রচুর মেধাবী এবং ভাল লেখক আছেন। ঈর্ষা দু'রকমের— একটা ক্ষতিকারক, আরেকটা ক্ষতিকারক না। এই দ্বিতীয়টির সঙ্গে মিশে থাকে প্রচণ্ড বিস্ময়। আমি যখন দস্তয়ভস্কির কোনো লেখা পড়ি তখন আমার প্রচণ্ড ঈর্ষা হয়। এই ঈর্ষার সঙ্গে মিশে থাকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং বিস্ময়বোধ। এ-জাতীয় ঈর্ষা আমার মধ্যে আছে এবং প্রচণ্ডভাবেই আছে। এটা না থাকলে আমি লেখালেখি চালিয়ে যেতে পারতাম না।

প্রশ্ন ঃ বাংলা ভাষার কোনো লেখককে ঈর্ষা করেন?

উত্তর ঃ বাংলা ভাষার অনেক লেখক আছেন যাঁরা আমার ঈর্ষার পাত্র। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ থেকে শুরু করে যারাই বাংলা ভাষায় লেখালেখি করেছেন সবাইকে আমি ঈর্ষা করি। অবশ্যই এই ঈর্ষার সঙ্গে মিশে আছে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা। এঁদের কোনো মহৎ লেখা যতবারই পড়ি মনে হয়, আহা যদি এত সুন্দর করে লিখতে পারতাম!

প্রশ্ন ঃ আপনিও অনেকের ঈর্ষার পাত্র, তা জানেন?

উত্তর ঃ আগে জানতে ইচ্ছে হয় সেই ঈর্ষার ধরন কেমন। ক্ষতিকারক ঈর্ষা, নাকি ভালবাসামিশ্রিত ঈর্ষা। যদি দ্বিতীয়টি হয় তাহলে অবশ্যই আমার জন্যে তা অত্যন্ত আনন্দের। আমি ক্রমেই মানুষের ঈর্ষার পাত্র হচ্ছি এবং ভালবাসা পাচ্ছি এটি ভাবতে কার না ভাল লাগে।

প্রশ্ন ঃ দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর কাছে আপনার লেখা প্রচণ্ড সমালোচিত। আপনি কি তা জানেন?

উত্তর ঃ আমার জীবন-যাপন একটু অন্যরকম। একা একা থাকি। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ছাড়া বাইরে কোথাও যাই না। যোগাযোগও নেই। এত সময়ও নেই আমার। কাজেই কে কি ভাবছে তা আমি জানি না। জানার কোনো আগ্রহও নেই। একটা সময় ছিল যখন বয়স ছিল কম। মাত্র লেখালেখি শুরু করেছি। তখন বুদ্ধিজীবী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সমর্থন হয়তবা আশা করেছিলাম, খুব আগ্রহ ছিল তখন কে কি বলছেন, কে কি ভাবছেন জানার জন্যে। আজকে সেই আগ্রহ আর নেই।

প্রশ্ন ঃ দেশজুড়ে আপনার অসংখ্য ভক্ত। অসংখ্য পাঠকের ভালবাসা পেয়েছেন আপনি। এজন্যেই কি এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভাবনা-চিন্তাকে আমল দিচ্ছেন না?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, অনেকটা তাই। আর আমার প্রয়োজনও নেই। আমাদের দেশের প্রধান কবি, প্রধান ঔপন্যাসিক কিংবা প্রধান সমালোচক আমাকে নিয়ে কি ভাবছেন তা জানার কোনো প্রয়োজন মনে করি না। আমি জানতে চাই একজন সাধারণ মানুষ, যে আমার বই পড়ছে, নাটক দেখছে—সে আমাকে নিয়ে কি ভাবছে। ওদের ভাবনা আমি জানি। আর জানি বলেই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভাবনা চিন্তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই।

প্রশ্ন ঃ লেখালেখির ব্যাপারে কখনও কোনো সাধারণ পাঠকের কাছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, অনেক পেয়েছি। তবে সেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আড়ালে ছিল ভালবাসা।

প্রশ্ন ঃ এসব বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ধরন কেমন ছিল?

উত্তর ঃ কারো হয়ত কোনো লেখা ভাল লাগেনি। কোনো চরিত্র পছন্দ হয়নি।

আমার কাছ থেকে আরও অনেক বড় মাপের লেখা আশা করছে। কোনো লেখা পড়ে হতাশ হয়েছে। কিংবা মনে হয়েছে এ-জাতীয় কথা আমি আগেও বলেছি কোনো উপন্যাসে, আবার পুনরাবৃত্তি করেছি। কিন্তু এসবের পেছনে লুকিয়ে ছিল শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং বড় ধরনের প্রত্যাশা। কুৎসিত কিংবা নোংরা অভিযোগ কেউ কখনও করেনি। এটি আমার জন্যে পরম সৌভাগ্যের।

প্রশ্ন ঃ এক পর্যায়ে এসে সব লেখকেরই কি রিপিটেশন শুরু হয়ে যায়?

উত্তর ঃ যাঁরা দুর্বল লেখক তাঁদের বেলায় হতে পারে, কিন্তু একজন শক্তিমান লেখকের বেলায় হয় না।

প্রশ্ন ঃ আপনার কিছু লেখায় রিপিটেশন আছে বলে কোনো কোনো পাঠক অভিযোগ করেছেন, যা আপনিও বললেন।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, মাঝে মাঝে এরকম হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কেমন লাগছে এ-জীবন?

উত্তর ঃ ভালই তো। কষ্টও হয় অনেক সময়। পৃথিবীর এত মায়া, ভালবাসা দেখে ভাবি এই জীবন এত কম সময়ের কেন? আর মনে হচ্ছে আমার সমস্ত সময় নিয়ে যাচ্ছে মানুষ। স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের দেয়ার মতো সময় বের করতে পারছি না। ওদের কাছ থেকে ক্রমেই যেন আমি দূরে সরে যাচ্ছি। একা হয়ে পড়ছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার ব্যক্তিচরিত্রে রাগ, জেদ না অভিমান—কোনটা অত্যন্ত প্রবল বলে মনে হয়?

উত্তর ঃ আমি প্রচণ্ড অভিমানী হয়ে জন্মেছি। এজন্যে জীবনে অনেক কষ্টও পেয়েছি। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। মানুষের চরিত্রে অভিমান যত কম থাকে ততই ভাল। অভিমান মানুষকে বড় কষ্ট দেয়।

প্রশ্ন ঃ স্কুলে পড়ার সময় শিক্ষকের মার খেয়েছেন?

উত্তর ঃ আমার শৈশবে শিক্ষকরা এসেছেন দুষ্টগ্রহের মতো। সমগ্র স্কুলজীবনে আমি পেয়েছি কঠিন শাস্তি। স্কুলে যাওয়ার প্রথম দিনেই একটি রূপবতী মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়ায় কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। ক্লাস সিক্স-এ পড়ার সময় খুব সুন্দরী এক মেয়েকে দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। স্যার কি পড়াচ্ছেন, বোর্ডে কি লেখা হচ্ছে কিছু খেয়াল করি না, আমার চোখ মেয়েটির দিকে। স্যার একদিন খেয়াল করলেন। আমাকে ভয়ংকর দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। প্রত্যেকদিন আমাকে ক্লাসে নানা প্রশ্নে জর্জরিত করতেন। আটকাতে পারতেন না। আমার স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। যে-কোনো পড়া একবার দেখলেই আর ভুলি না। একদিন সত্যি সত্যি আটকে গেলাম ঐ স্যারের কাছে। আমার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করা হল একটি কাগজে 'আমি গাধা' লিখে গলায় ঝুলিয়ে পুরো স্কুল ঘুরতে হবে। অপমানে, কষ্টে মাথা-খারাপ হওয়ার মতে অবস্থা। টান দিয়ে গলা থেকে কাগজের টুকরো ছিঁড়ে ফেলি। স্যার'কে উদ্দেশ্য করে 'আপনি গাধা' বলে দৌড়ে বেরিয়ে আসি। ঐ স্কুলে আর যাইনি।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে প্রচণ্ড ভোজনরসিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন আপনার কিছু ঘনিষ্ঠজন। কথাটা সত্যি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। আমি ভাই খেতে পছন্দ করি। খাওয়াতেও আনন্দ পাই। ক্ষুধা একদম সইতে পারি না। ক্ষুধা পেলেই মনে হয় যেন চোখে অন্ধকার নেমে আসছে। ছোট ছেলেমেয়েরা প্রথম এবং শেষ রোজা রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে। আমি তাও পারি না। প্রথম রোজাটা রাখি। আর পারি না। কোনোভাবেই সম্ভব হয় না।

প্রশ্ন ঃ কখনো কি আপনার মনে হয়েছে পৃথিবীতে বৃথাই এসেছেন?

উত্তর ঃ না, মনে হয়নি। ভয়াবহ দুর্দিনেও আমি বেঁচে থাকার আনন্দ টের পাই। এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার কথা মনে হতেই বড় কষ্ট হয়। দু'চোখের পাতা বুজে আসে। বুকের ভেতরটা কুঁকড়ে ওঠে।

প্রশ্ন ঃ জীবনে ঝোঁকের মাথায় কখনও কোনো কাজ করেছেন?

উত্তর ঃ বেশির ভাগ কাজই করেছি ঝোঁকের মাথায়। কি হবে না- হবে ভাবিনি। সায়েন্সের ছাত্র হয়েও ঝোঁকের মাথায় অর্থনীতিতে ভর্তি হয়েছিলাম। একদিন রসায়ন বিভাগে গিয়ে মনে হল এখানে ভর্তি হওয়া উচিত ছিল। পাল্টে চলে এলাম রসায়নে। আমেরিকায় পিএইচ ডি করতে গেছি ভৌত রসায়নে। দু'বছর পড়ার পর মনে হল আমার পলিমার রসায়ন পড়া উচিত। দু'বছর পর পিএইচ ডি'র বিষয় পরিবর্তন করতে দেখে সবাই আমাকে রাম বোকা ভেবেছেন। কিন্তু আমি ঝোঁককে সম্মান করেছি। গুলতেকিনকে বিয়েও করেছি ঝোঁকের মাথায়। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষক। সবাইকে নিয়ে থাকি। দু'-ভাইবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। আটশ টাকা বেতন। শহীদ পরিবার হিসেবে পাওয়া সরকারি বাসাটি ১৫ দিনের মাথায় ছেড়ে দেয়ার নোটিশ মাথায় ঝুলছে। মাসের শেষদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পয়সা থাকে না। হেঁটে হেঁটে ফিরি। ঠিক এমন অবস্থায় ১৫ বছরের বালিকা গুলতেকিনকে বিয়ে করে ফেলি। মা তাঁর শেষ সম্বল বাবার দেয়া হাতের বালা বিক্রি করে বিয়ের বাজার করলেন। ভাইবোনরা পাশের বাসা থেকে জিনিসপত্র এনে আমার বাসর সাজালো। সকালে পুলিশের গাড়ি এসে হাজির। বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। পাশের বাড়ির লোকেরা এসে সাজানো বাসর ঘরের চাদর, বেতের চেয়ার, ক্যাসেট প্লেয়ার, ফ্যান সবই নিয়ে গেল। গুলতেকিন প্রশ্ন করছে। আমার মানসিক অবস্থা নেই কোনো উত্তর দেয়ার। তাকে নিয়ে বেরিয়ে যাই বাসা থেকে।

প্রশ্ন ঃ সবসময়ই কি এই ঝোঁকের মাথায় চলেন?

উত্তর ঃ না। প্রতিটি কাজকর্ম, চিন্তাভাবনায় আমি অত্যন্ত গোছানো। কবে কি করব, কিভাবে করবো সবই রুটিনমাফিক। সময় ভাগ করা থাকে। তার পরও কোনো সময় এই কঠিন রুটিন ভঙ্গ করি। এলোমেলো হয়ে যাই। এমন এক কাজ করে বসি যা কোনো সুস্থ লোক চিন্তাও করতে পারবে না।

প্রশ্ন ঃ আপনার কাছে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ— অতীত, বর্তমান, নাকি ভবিষ্যৎ?

উত্তর ঃ আমার কাছে বর্তমানটাই সত্যি। অতীত কিছু না। ভবিষ্যৎ তো প্রশ্নই আসে না। আমরা বাস করি বর্তমানে—অতীতেও না, ভবিষ্যতেও না।

প্রশ্ন ঃ একসময় আপনি নাকি যাদুবিদ্যায় বেশ পারদর্শী ছিলেন?

উত্তর ঃ পারদর্শী ঠিক না। অল্পসল্প জানতাম।

প্রশ্ন ঃ কোনো ফাংশনে যাদু দেখিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টি এস সি) একবার হলভর্তি ছাত্র-শিক্ষকের উপস্থিতিতে কয়েকটি যাদু দেখিয়ে বেশ হাততালি পেয়েছিলাম। আমি তখন প্রথম বর্ষের ছাত্র।

প্রশ্ন ঃ এরপর ক্যাম্পাসে আপনার অবস্থা?

উত্তর ঃ অনেকেই ধরতেন যাদু দেখাতে। শিক্ষকরা তাঁদের বাসায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতেন যাদু দেখানোর জন্যে।

প্রশ্ন ঃ আর কোনো বড় অনুষ্ঠানে?

উত্তর ঃ ঢাকা জুট মিলে দেখিয়েছিলাম একবার। এজন্যে দু'শ টাকা দেয়া হয় আমাকে সম্মানী। টেলিভিশনেও ডাক পেয়েছিলাম। তখন ডিআইটিতে টিভি ভবন। সরাসরি প্রচার হত, অনুষ্ঠান। রেকর্ডিং সিস্টেম ছিল না। আমার দেখানো যাদু প্রচারিত হল টিভি থেকে। আনন্দের সীমা রইল না। টিভি ভবন থেকে বেরিয়ে আসার সময় মনে হচ্ছিল, সবাই বুঝি আমাকে দেখছে। কি মজার ব্যাপার!

প্রশ্ন ঃ এই যাদুর নেশা কখন কাটল আপনার?

উত্তর ঃ বিয়ের রাতে। পরম আগ্রহ নিয়ে গুলতেকিনের কাছে আমার যাদুবিদ্যা জাহির করতে শুরু করলাম। কিন্তু আমার বালিকাবধূ আমার কৌশল ধরে ফেলল। একবার না। পরপর দু'বার। প্রচণ্ড হেসে ফেলল সে। চূড়ান্তরকম অপমান বোধ করলাম এই বালিকার কাছে। মনে হয় নবপরিণীতা স্ত্রীর সামনে প্রচণ্ড নার্ভাস ছিলাম। সেই থেকে আর কখনো ম্যাজিক দেখাই না।

প্রশ্ন ঃ আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন কেমন কেটেছে?

উত্তর ঃ খুব চমৎকার বা অসাধারণ— এমন মন্তব্য করা যাবে না। তখন ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত বাজে। শিক্ষকরা ছাত্রদের সঙ্গে মিশতেন না। ক্লাসের বাইরে কথা বলতেন না। দূরত্ব বজায় রাখতেন। ধরা বাধা পড়াশোনা ছাড়া অন্যদিকে মন দেয়ার সুযোগই ছিল না। কঠিন এবং হৃদয়হীন এক পরিবেশ ছিল।

প্রশ্ন ঃ ছাত্রছাত্রীদের চালচলনে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল?

উত্তর ঃ ছিল। একবার আমাদের ডিপার্টমেন্টের বারান্দায় দু'টি ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। চেয়ারম্যান তাদের ডেকে নিলেন। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, আর ছেলেটিকে চলে যেতে হল ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে।

প্রশ্ন ঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তখন সন্ত্রাসের ধরন কেমন ছিল?

উত্তর ঃ সরকারসমর্থিত ছাত্র সংগঠন এন এস এফ ক্যাম্পাসে রীতিমত ত্রাস সৃষ্টি

করে রেখেছিল, হকিস্টিক, ছুরি, রিকসার চেইন নিয়ে তারা ঘোরাফেরা করত। কয়েকজনের কাছে ছিল পিস্তল। হলের বাবুর্চি এসব মাস্তানদের জন্যে আলাদা রান্না করত। মাঝেমধ্যে মেয়েদের হলে এনে আটক রাখত। স্যাররা এসব জানতেন। কিন্তু দেখেও না- দেখার ভান করতেন। একদিন এক শিক্ষককে চূড়ান্ত অপমান করা হল এক পতিতাকে দিয়ে। আজকাল কোনো কোনো শিক্ষক যখন বলেন, তাঁদের সময়টা ছিল স্বর্ণযুগ, তখন আমি না হেসে পারি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তখনো ছিলেন অসহায়, এখনো। তাঁদের মেরুদণ্ড আগেও সোজা ছিল না। এখনো না।

প্রশ্ন ঃ বিয়ের ঘটকালী করেছেন কখনও?

উত্তর ঃ একটি হিন্দু বিয়ের ঘটকালী করেছি। পাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক। গ্রামের এক কলেজে পরীক্ষা নিতে গিয়ে পাত্রীকে পছন্দ করেছিলাম। স্ত্রী-সন্তান সবাইকে নিয়ে এই বিয়েতে গিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ বাজারে কেনাকাটা করতে গিয়ে মারাত্মকভাবে ঠকেছেন কখনও? এজন্যে মন খারাপ হয়েছে?

উত্তর ঃ সবসময়ই ঠকি। কখনো জিততে পারিনি। এখন আর যাই না। ঠকার জন্যে নয়, একবার মন-খারাপ হয়েছে অন্য কারণে। সামান্য একটা ইলেকট্রিক্যাল পার্টস কিনতে গেছি। দোকানি দেখেই আমাকে চিনল। অনেক যত্ন করল। দাম জিজ্ঞেস না করতেই বলল, আপনার কাছে ব্যবসা করলে পাপ হবে। যে দাম চাইল তা দিয়েই পার্টস কিনলাম। মনে কেন যেন সন্দেহ হল। অন্য এক দোকানে দাম জিজ্ঞেস করলাম। শুনে আঁতকে উঠলাম। আরেক দোকানে জিজ্ঞেস করলাম, সেখানেও একই দাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ঠকার জন্যে নয়, লোকটি এমনভাবে কথা বলল আমার সঙ্গে সামান্য ক'টা টাকার জন্যে? এত ক্ষুদ্রতা কেন মানুষের? যদিও জানি আমারও অনেক খুঁত আছে। তবুও কেন জানি না অন্য কারও মধ্যে তা দেখলে সহ্য করতে পারি না।

প্রশ্ন ঃ মন-খারাপ হলে কিংবা রাতে ঘুম না এলে কি করেন?

উত্তর ঃ বই পড়ি। রাতজাগা রোগ হলে আমি স্টেইনব্যাকের দু'টি বই প্রায়ই পড়ি। একটি 'ক্যানারী রো'। কয়েকজন ভবঘুরে অলস যুবককে নিয়ে গল্প। আরেকটি 'টরটিল্লা ফ্ল্যাট'। এটি অসম্ভব রহস্যময় গল্প।

প্রশ্ন ঃ যে গ্রন্থের জন্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন স্টেইনব্যাক, সেই 'গ্রেপস অব র‍্যাথ'?

উত্তর ঃ আমার কেন জানি একেবারেই ভাল লাগেনি। প্রবল উৎসাহ নিয়ে পড়তে শুরু করেছিলাম, কিন্তু অনেক কষ্টে একবার পড়েছি। দ্বিতীয়বার পড়তে আজ পর্যন্ত ইচ্ছে হয়নি।

প্রশ্ন ঃ আপনার জন্ম যদি একজন রিকশাওয়ালার ঘরে হত, তা হলে আজকের অবস্থানে আসার কথা ভাবতে পারতেন?

উত্তর ঃ এর চেয়ে ভাল অবস্থানেও তো থাকতে পারতাম।

প্রশ্ন ঃ আপনি ভাগ্যে বিশ্বাস করেন?

উত্তর ঃ কিছুটা তো অবশ্যই। তবে হাত-পা গুটিয়ে কেবলই ভাগ্যের ওপর ভর করে বসে থাকা নয়।

প্রশ্ন ঃ কখনও আপনাকে মিথ্যে বলতে হয়? কেমন লাগে মিথ্যে বলতে?

উত্তর ঃ লেখালেখি নিয়ে খুব ব্যস্ত, এমন সময় কেউ ফোন করলে বাসা থেকে বলে দেয়া হয় আমি নেই। প্রকাশক, পত্রিকার লোকজন এবং দর্শনার্থীদের অসময়ে সাক্ষাৎকার না দেয়ার জন্যেও মিথ্যে বলতে হয়। এসব ক্ষেত্রে মিথ্যে বলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। মনের দিক থেকে পরিচ্ছন্ন থাকলে এসব ক্ষেত্রে খারাপ লাগার কথা নয়।

প্রশ্ন ঃ নিজের ভুল ধরতে পারলে কি করেন?

উত্তর ঃ আমিই আমার সবচেয়ে বড় সমালোচক। আমার যে কোনো ভুল আমার চোখেই প্রথম পড়ে। নেপথ্য কারণ তলিয়ে দেখার পর অবশ্যই শুধরে নিই।

প্রশ্ন ঃ স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করেন? যদি তা লোভনীয় কিছু বা দুঃস্বপ্ন হয়?

উত্তর ঃ এটা অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার। স্বপ্ন দ্বারা আমি প্রভাবিত হই না। তবে দেখতে ভালই- তো।

প্রশ্ন ঃ কি ধরনের পোশাকে অস্বস্তিবোধ করেন?

উত্তর ঃ এই একটি ব্যাপারে আমি অত্যন্ত অসচেতন। হাতের কাছে যা পাই পরে নিই। তবে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে গুলতেকিনই তদারকি করে। পোশাকের ব্যাপারে আমার তেমন পছন্দ-অপছন্দ নেই। তবে রুচিহীন নিশ্চয়ই না।

প্রশ্ন ঃ জুয়া খেলার প্রতি আপনার আগ্রহ জানি। কেন? সর্বোচ্চ কত হেরেছেন?

উত্তর ঃ জুয়া খেলায় অজানা এক রহস্য কাজ করে। যে-কেউ জিততে পারে। আগাম কিছুই বলা যায় না। একইসঙ্গে এই রহস্য এবং রোমাঞ্চকর অনুভূতি প্রত্যেকের মধ্যে কাজ করে। তাই বলে আমি জুয়ার পক্ষে সাফাই গাইছি না। জুয়া জুয়াই। অকেশনালি দু'-একবার খেলেছি এবং প্রতিবারই চরম হার হেরেছি।

প্রশ্ন ঃ হাসপাতালের প্রতি খুব অনীহার পরিচয় মেলে আপনার লেখায়। কেন?

উত্তর ঃ এটা হাসপাতালগুলোর অব্যবস্থার জন্যে। যে-কোনো সুস্থ ভদ্রলোক এ-দেশের কোনো হাসপাতালে গেলে ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠবে।

প্রশ্ন ঃ 'আর্থিক সফলতাই হচ্ছে জীবনের অর্ধেক বিজয়' বলেছেন স্পারজিয়ন। আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ এই সাফল্য যদি সৎ পথে আসে এবং উপযুক্ত ব্যবহার হয়, তা হলে না মেনে নেয়ার কারণ নেই।

প্রশ্ন ঃ ঢাকা শহরে ট্রাফিক জ্যামে পড়েছেন নিশ্চয়ই। একটি অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

উত্তর ঃ একবার জরুরি কাজে এক জায়গায় যাচ্ছি। নিউমার্কেট এলাকায় প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যামে পড়ে গেলাম। ট্রাফিক ভদ্রলোক এই জ্যামের মধ্যে এসে ড্রাইভারের কাগজপত্র চাইলেন। তখন ওর সঙ্গে কোনো কাগজপত্র ছিল না। ড্রাইভারের ওপর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সে আবার হি-হি করে হাসছেও। জ্যাম কেটে গেল। কিন্তু ট্রাফিক আমার গাড়ি ছাড়ল না। আমার অবস্থা তখন চিন্তা করুন। সোজা গাড়ি থেকে নেমে রিকশা নিয়ে আমি চলে যাই।

প্রশ্ন ঃ শ্যামলীর ছোট্ট ঘর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা ছেড়ে আজকের এই বিশাল ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকা, ধানমণ্ডিতে বাড়ি করার কথা, এসব ভেবেছেন কখনও?

উত্তর ঃ না, ভাবিনি। এত সচ্ছলতা পাব লেখালেখি করে কল্পনাও করিনি।

প্রশ্ন ঃ স্ত্রী ছাড়া আর কারো রান্না পছন্দ করেন? আপনি তো ভীষণ ভোজনরসিক মানুষ। তাই না?

উত্তর ঃ মায়ের রান্না আমার খুব প্রিয়। ভোজনরসিক কি না জানি না, আমি খেতে এবং খাওয়াতে খুব ভালবাসি।

প্রশ্ন ঃ কখনও হতাশায় ভোগেন? জীবনকে অর্থহীন মনে হয়?

উত্তর ঃ সাময়িক হাতাশা কার না হয়। অতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়েও অল্প সময়ের জন্যে হতাশা কাজ করতে পারে। কিন্তু জীবনকে কখনোই অর্থহীন মনে হয় না।

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রথম জীবন খুব অর্থকষ্টে কেটেছে। এখন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। দুটো আলাদা জীবন আপনাকে কিভাবে প্রভাবিত করছে?

উত্তর ঃ আমার অর্থকষ্ট ছিল, কিন্তু ভালবাসার অভাব কখনও হয়নি। এই জীবনে প্রচুর ভালবাসা পেয়েছি আমি, যা পাওয়ার যোগ্য নই। আমি দেউলিয়াপনা কিংবা কৃপণতাকে ঘৃণা করি।

প্রশ্ন ঃ ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের মুখোমুখি হতে কেমন লাগে? ওদের চোখে নিজেকে কেমন লাগে?

উত্তর ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে আমি খুব কঠিন বিষয় পড়াই। তার ওপর প্রতিদিন নতুন নতুন টপিকস। ছাত্ররা চোখের পাতা না ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে করে আমি যা বলছি তাই পৃথিবীর সবচেয়ে সত্যি কথা, যে কথা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। ওদের চোখে তখন আমি রীতিমত ঈশ্বর।

প্রশ্ন ঃ একদিনের জন্যে দেশের শাসনভার পেলে কোন কাজটি আগে করবেন?

উত্তর ঃ ক্ষমতার প্রতি আমার কোনো মোহ নেই, এ নিয়ে আমি ভাবি না।

প্রশ্ন ঃ শেষ কবে কেঁদেছেন কেন?

উত্তর ঃ অন্যের লেখা পড়ার সময় আমি প্রায়ই কাঁদি, নিজে যখন লিখি তখনও প্রায়ই আমার চোখে পানি এসে যায়। কখনও কোনো চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি তৈরি করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই চোখের পানি ফেলি। আবার লেখার আনন্দেও কাঁদি। 'কোথাও কেউ নেই' সিরিজ নাটকের শেষ পর্ব লেখার পর কেঁদেছি। শিল্পীদের সামনে

পড়ে শোনানোর সময়ও কেঁদেছি। না কেঁদে আমি পারি না। এটা আমার অভ্যাস কিংবা অসুখও হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আরেক জীবন পেলে কি হতে চাইবেন?

উত্তর ঃ প্রথমে মানুষ। পরে লেখক। কেবলই লেখক।

প্রশ্ন ঃ আপনার শিক্ষক পরিচয়টি ক্রমশই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে লেখক পরিচয়ের কাছে। আপনার কি মনে হয়?

উত্তর ঃ তাই তো মনে হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ একজন সফল শিক্ষকের চেয়ে একজন লেখকের পরিচয় আপনাকে অধিক আকর্ষিত করে কি?

উত্তর ঃ আমি একজন লেখক, এই পরিচয় আমাকে আনন্দ দেয়, মুগ্ধ করে। আমি জনপ্রিয় কিংবা সফল লেখক কি না জানি না, তবে কেউ ব্যর্থ শিক্ষক বললে তা কিন্তু মেনে নেব না।

প্রশ্ন ঃ একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, আপনার মাথায় কোনো গল্পের প্লট আসছে না। কিছুতেই এক কলম লেখা আসছে না। কি করবেন?

উত্তর ঃ এমন অবস্থায় পড়লে মনে হয় পাগল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রশ্ন ঃ কখনও আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন?

উত্তর ঃ মনে তো হয় না।

প্রশ্ন ঃ নিজের চেহারা, ফিগার এবং সৌন্দর্য নিয়ে আপনার ধারণা কেমন?

উত্তর ঃ আমি দেখতে কুৎসিত নই, এটুকু জানি।

প্রশ্ন ঃ আপনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হয়েছে। এতে আপনার জেলও হয়ে যেতে পারে। এ-ব্যাপারে কিছু ভাবেন?

উত্তর ঃ আদালতে হেরে গেলে শাস্তি হিসেবে যা নির্ধারিত হয়, তাতো মেনে নিতেই হবে। তবে জেলে একটানা বেশিদিন বোধ হয় থাকতে পারব না। এক মাসের বেশি হলে পাগলের মতো হয়ে যাবো। আমি স্ত্রী-সন্তানদের ছেড়ে থাকতে পারি না।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা ধরুন, আপনার জেল হয়ে গেল এবং বলা হল এরশাদ অথবা গোলাম আযম— যে-কোনো একজনের সঙ্গে একই সেলে থাকতে হবে। আপনি কাকে বেছে নেবেন?

উত্তর ঃ হাস্যকর প্রশ্ন, জবাব দিচ্ছি না।

প্রশ্ন ঃ কারাগারে এরশাদ আপনাকে নিজের লেখা কবিতা পড়ে শোনাচ্ছে আর গোলাম আযম জামায়াতের সবক দিচ্ছে। এটি ভাবতে কেমন লাগে?

উত্তর ঃ এই প্রশ্নগুলি কি না করলেই নয়?

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখালেখির কৌশল সম্পর্কে জানতে চাইছি। গল্পের প্লট ঠিক করে লিখতে বসেন, নাকি থীমটাই কেবল মাথায় রাখেন?

উত্তর ঃ আগে থেকে ঠিক করে রেখে কখনো আমি সে অনুযায়ী লেখা শেষ করতে

পারি না। হয়ত নির্দিষ্ট প্লট ভেবে লিখতে বসলাম, কিন্তু কলমের টানে চলে গেলাম অন্য এক জায়গায়।

প্রশ্ন ঃ কখনও কি মনে হয় আপনার লেখার বিষয় ফুরিয়ে আসছে?

উত্তর ঃ না। আজ পর্যন্ত না।

প্রশ্ন ঃ "একটি লেখা লিখতে কতবার ছিঁড়েছি আর কতবার বসেছি হিসেব নেই। খুঁতখুঁতেপনা আর অতৃপ্তি না থাকলে বোধ হয় মনের মতো কোনো লেখাই হয় না।" বিমল করের এই অভিজ্ঞতা আপনার ক্ষেত্রে কতটা সত্যি?

উত্তর ঃ অনেকটা সত্যি।

প্রশ্ন ঃ একজন লেখক বা দার্শনিকের নিজ দর্শনের সঙ্গে যদি ব্যক্তিজীবনের বিরাট ব্যবধান থাকে?

উত্তর ঃ পাঠকদের বিভ্রান্ত হওয়ারই কথা।

প্রশ্ন ঃ দার্শনিক রুশো ছিলেন কামার্ত, লম্পট এবং অনেক অবৈধ সন্তানের দায়িত্বহীন জনক। যিনি অনুরাগিণীদের গর্ভবতী করে ফেলে যেতে দ্বিধা করেননি। তিনিই আবার দর্শনচর্চার সময় খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন সঠিক পিতৃত্বের ব্যাপারে।

দুশ্চরিত্র ছিলেন টলস্টয়ও। নিজের অবৈধ সন্তানদের তিনি ভূমিদাসের কাজে লাগিয়েছেন। পরিচারিকাদের গর্ভবতী করেছেন । আর শেষ জীবনে ধর্ম ও নিষ্কামতা প্রচার করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে— একজন লেখকের ব্যক্তিগত ব্যাভিচার তাঁর লেখাকেও প্রভাবিত করে বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ কিছুটা করতে পারে। সব পাঠক এর দ্বারা প্রভাবিত হন না। খুব কম-সংখ্যক পাঠকই প্রভাবিত হন।

প্রশ্ন ঃ অনেক পাঠকের মতে আপনার সৃষ্ট চরিত্র মিসির অলী আপনারই ছায়া, কি বলেন?

উত্তর ঃ আমার ব্যক্তিচরিত্রের কিছুটা মিল মিসির আলির মধ্যে আছে। আমি যুক্তি ভালবাসি। মিসির আলি এক যুক্তিবাদী লোক। মিসির আলি রহস্যের অনুসন্ধান করেন। আমিও করি।

প্রশ্নঃ সেন্ট মার্টিন দ্বীপে আপনি একটি বাড়ি বানিয়েছেন, যার নাম দিয়েছেন সমুদ্রবিলাস। সমুদ্রতীরে এই বাড়ি বানানোর রহস্য জানাবেন?

উত্তরঃ একসময় আমি প্রচণ্ড ঘরকুনো ছিলাম। দিনরাত ঘরেই থাকতাম। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বের হতাম না। আমেরিকায় থাকাকালীন একদিন অনেক রাতে ভরা পূর্ণিমায় সমুদ্রতীরে গিয়ে আমার সবকিছু বদলে গেল। পূর্ণিমার আলোতে সমুদ্র দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। মনে হল গোটা সমুদ্রই যেন একটি আলোর থালা। ভাবলাম এর আশেপাশে যদি একটি ঘর বানিয়ে থাকতে পারতাম, তা হলে জীবনে আর কিছু চাইতাম না। কিন্তু এটা তো অসম্ভব। দেশে ফিরে এক ভরা-পূর্ণিমায় স্ত্রী-সন্তান নিয়ে কক্সবাজার গেলাম। কারণ, পূর্ণিমারাতের সমুদ্র আমাকে পেয়ে বসেছে এরই মধ্যে।

সেন্ট মার্টিন দেখে আরও অভিভূত হলাম। মনে হল পৃথিবীতে এত সুন্দর জায়গা আছে! ঠিক যেন স্বপ্নের মতো। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এখানে সমুদ্রতীরে একটা ঘর বানানো অসম্ভব কিছু না। প্রয়োজন কেবল মনের তাগিদ। তাতো আমার প্রয়োজনের চেয়ে কয়েক'শ গুণ বেশিই। কাজেই সমস্যা হল না। তবে কেউই প্রথমে আমার কথা বিশ্বাস করছিল না। মনে করেছিল ঝোঁকের মাথায় বলছি। সেন্ট মার্টিনে কেউ জায়গা কিনে বাড়ি বানাতে পারে, এটা শুধু কোনো মস্তিষ্কবিকৃত লোকের পক্ষেই সম্ভব এরকম ছিল সবার মতামত।

প্রশ্নঃ 'সমুদ্র বিলাস' আপনার স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা পছন্দ করেছে?

উত্তরঃ আমার স্ত্রী করেছে। প্রথমদিকে অবশ্য না। আর দশটি পাগলামোর মতো এটাকেও একটি মনে করত। আর ছেলেমেয়েদের পছন্দ করার মতো মানসিকতা এখনও তৈরি হয়নি।

প্রশ্নঃ 'সমুদ্র বিলাস' নিয়ে ভবিষ্যতে আপনার কোনো বিশেষ পরিকল্পনা আছে?

উত্তরঃ পাঠকদের ভালবাসায় এ বাড়িটি আমি বানিয়েছি শুধু আমার জন্যে নয়, দেশ-বিদেশের সমস্ত ক্রিয়েটিভ মানুষের জন্যে। যাঁরই ইচ্ছে হবে, যেতে পারবেন। বিনা খরচে যেন থাকতে পারেন, প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যেতে পারেন—এরকম একটা ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা আমার আছে। যদি কোনো লেখক সমুদ্র বিলাসে একরাত থেকে কখনও বলে ওঠেন—পৃথিবী কী সুন্দর! তা হলে আমার চেয়ে আনন্দ আর কেউ পাবে না।

প্রশ্নঃ 'সমুদ্র বিলাস' কি আপনার পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবেই থাকবে?

উত্তরঃ না। আমি সরকারের হাতে তুলে দিয়ে যাব। আমার ছেলেমেয়েরা কখনও এর দাবি করবে না।

প্রশ্নঃ সমুদ্র বিলাসে রাত্রি যাপনের জন্যে অনেক লেখকের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। শুনেছি সমরেস মজুমদার সপরিবারে আসছেন কিছুদিন ওখানে থাকার জন্যে। অনেকেরই কৌতূহল সমুদ্র বিলাসে থাকার ব্যবস্থা কেমন জানার জন্যে।

উত্তরঃ খুবই সাদাসিধে। প্রকৃতির বিছিয়ে দেয়া সৌন্দর্যের মাঝখানে একটি ঘর। চারপাশ কাঠের। উপরে টিন। যেন বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ থেকে বঞ্চিত হতে না হয়। ভেতরে দু'টি শোবার ঘর। দু'টি বাথরুম ও রান্নাঘর। আর একটি বড়সড় হলরুম। প্রতিটি রুমে ফার্নিচার এবং প্রয়োজনীয় আসবাব। থাকার মতো প্রয়োজনীয় সবই আছে। একজন কেয়ারটেকার আছেন, যিনি সবকিছু দেখাশোনা করেন।